

অজানা
সিরিজ

জল

ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সাম্পাদনা

সঞ্জয় কর

অয়ন প্রকাশন
৪ নিমাই বোস লেন ● কলিকাতা ৬

পরিবেশক

রূপম

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৩ ● প্রকাশক শ্রীআশিস্ কুমার বর্দ্ধন ● ছেপেছেন শ্রীশান্তিনাথ পান ● সুশীলা মুদ্রণ ● কভার ছেপেছেন প্রিণ্টওরিয়েণ্ট ● ছবি এঁকেছেন শ্রীসোমনাথ রায় ● দাম-১০'০০

স্নেহের রিঙ্কু,

জলের সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে-সব কথা বলেছেন, সে-সব কথাগুলোই বলেছি ; ভালো করে পড়বে।

বাবা।

১২ই মার্চ
শিবরাত্রি
গড়িয়া।

কয়েকটি কথা ঃ

পৃথিবীর ইতিহাস জলের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে আলোচনা করা যায় না। তাই, যদি কোনো বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে, তাহলে তিনি প্রথমেই দেখবেন সেই গ্রহে জল আছে কিনা। কেননা জল না থাকলে প্রাণের আবির্ভাব হয় না। এই জন্যেই জলের অপর নাম জীবন। এই জলই অতীতে আমাদের পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছে, এখনও ঘটাচ্ছে।

এই জলে ক্ষত আরোগ্য হয়, মৃত পায় জীবন। পৃথিবীতে জীবনের যে প্রবাহ চলেছে তাতে রয়েছে "অমৃতবারির" স্নিগ্ধ সিঞ্চন। চারিদিকের সবুজ বনানীর ঢেউ, পুষ্পিত মাঠের বর্ণসুষমা, নৌকাবিহারের দুরন্ত আবেগ, শীতের স্কেটিং-এর উল্লাস—সবই তো জলের দৌলতে। সুতরাং এমন এক পৃথিবীর কথা আমরা ভাবতে পারি না যেখানে জল নেই।

জলের প্রয়োজনের কথা আমরা কখনও অস্বীকার করতে পারি না। কেননা জল হলো পৃথিবীর মহত্তম রাসায়নিক পদার্থ। প্রাকৃতিক কোনো প্রক্রিয়াই জল ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না। নতুন শিলা গঠনের, কোনো নতুন খনিজের আবির্ভাবে কিম্বা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিচিত্র জটিল জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই কারণেই জল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অসীম কৌতূহল।

বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি জলের স্বভাব-ধর্মের কথা। জলের মেজাজ যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। তা না হলে জলে বরফ ভাসে কি কোরে? পৃথিবীতে এমন কোনো পদার্থ নেই যার মেজাজ জলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জলের বিচিত্র রূপ আর বিচিত্র মেজাজের কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। এতে যদি জলের স্বাদ আর তৃষ্ণা মেটে তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শ্রীসঞ্জয় করকে যিনি যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। শ্রীআশিস বর্ধন পরিশ্রম করেছেন, সুতরাং তার প্রতি রইল আমার প্রীতি। ছবি আঁকার কাজ করেছেন শ্রীসোমনাথ রায়, শান্তিনাথ প্রেস ও প্রিন্টওরিয়েন্টের কর্মীরা কাজ করে বইটি প্রকাশ করেছেন—এঁদের সকলকেই আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী

New Encyclopedia of Science Vol 1 to 16

The Penguin Dictionary of Geography W. G. Moore

A Dictionary of Biology ; M. Abercrombic, C.J. Hickman
M. L. Johnson.

Tell me why—Arkady Leokum

Lots Tell me why— Do

More More Tell me why Do

Still More Tell me why Do

The Book of Knowledge Vol 1 to 8

Science Today (Journal)

Science Reporter (Journal)

বিজ্ঞান ভারতী—শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলিত

রসায়নের শতগল্প (মস্কো)

জ্ঞান বিজ্ঞান (মাসিক পত্রিকা)

॥ সূচীপত্র ॥

টীকা

জল কি ?

সুদূর কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, এ'কথাটা কোনো বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রথমেই চিন্তা করবেন ঃ সেই গ্রহে জল আছে কি না ? কেননা জল ছাড়া যেমন জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তেমনি জলের কোনো বিকল্পও নেই। এই কারণেই জলের অপর নাম জীবন।

জলের স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই। আমাদের পৃথিবীটা তো বেশির ভাগ জলে ভরা। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। এই কারণেই প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে জলের আধিক্য। মানুষের দেহে প্রায় শতকরা ৭১ ভাগ জল। সুতরাং এ'কথাটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের কাছে জল হলো অপরিহার্য। আমরা যে খাদ্য খাই তা কখনই পরিপাক হত না, যদি না সেই খাদ্য জলে গুলে যেতো। জল হলো সব চেয়ে বড় দ্রাবক। প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ দলা পাকিয়ে গড়ে তোলে টিস্যু বা কলা ; আর এই টিস্যুতেই থাকে জলের অস্তিত্ব।

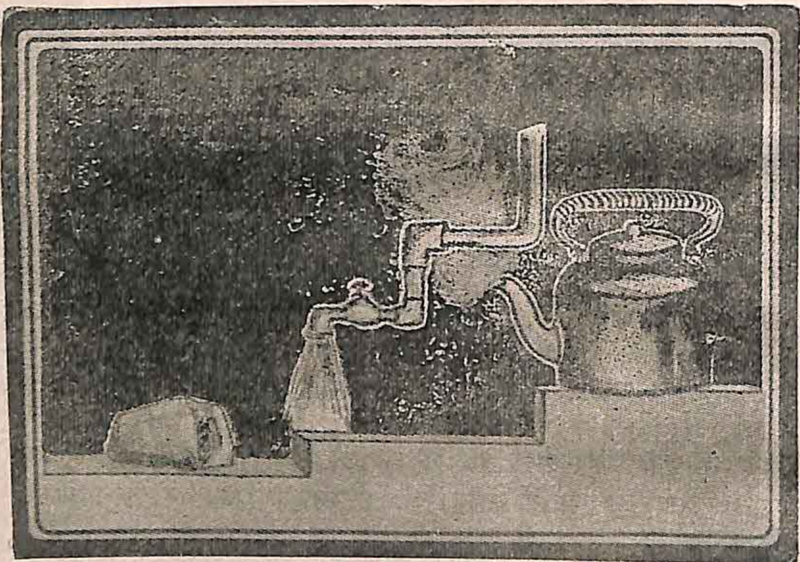
আমরা ডাঙার মানুষ। পৃথিবীর জলের পরিমাণ ও গুরুত্ব যে কত তা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি না। তবে জল যে নানা রূপ ধরে আমাদের চারদিকে রয়েছে সেটা আমরা জানি। ভূ-পৃষ্ঠে, মাটির তলায় এমন কি বাতাসেও মিশে রয়েছে জল।

জলের উপাদান কি কি ? জল হলো যৌগিক পদার্থ। দুটি পদার্থের সমন্বয়ে জলের সৃষ্টি। একটি হলো সব চেয়ে হালকা গ্যাস—হাইড্রোজেন, অপরটি হলো বেশ সক্রিয় গ্যাস—অক্সিজেন। যখন অক্সিজেনে হাইড্রোজেন গ্যাস পোড়ানো হয় তখনই সৃষ্টি হয় জল। কিন্তু জলের ধর্মে না আছে হাইড্রোজেন না আছে অক্সিজেন। জলের নিজস্ব ধর্ম আছে ; অর্থাৎ জল ঠিক জলের মত।

যার আকার আয়তন ও ওজন আছে তাকে বলে পদার্থ। বেশীর ভাগ পদার্থের মতই জলের তিনটি রূপ। জলকে আমরা তরল রূপেই দেখতে অভ্যস্ত ; জল যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলে বরফ ; আর জল যখন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলে জলীয় বাষ্প। জল যে

কখন কোন রূপ নিয়ে থাকবে তা মূলত নির্ভর করবে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর।

০° সেন্টিগ্রেড অথবা ৩২° ফারেনহাইট উষ্ণতায় জল তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এটাই জলের হিমাংক। আবার ১০০° সেন্টি-গ্রেডে অথবা ২১২° ফারেনহাইটে জল তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এটা হলো জলের স্ফুটনাংক। আমাদের চোখে-দেখা তরল



জলের রূপ

জল যখন বাষ্পীয় আকারে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায় তখনকার সেই অবস্থাকে বলে বাষ্পীয়ভবন।

কোনো একটা গরম ঘরে যদি এক খণ্ড বরফ আনা হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেটা গল্‌তে গল্‌তে তরল হয়ে যাচ্ছে। এখন ঘরটা যদি আরও গরম হয় অর্থাৎ ঘরের উষ্ণতা যদি স্ফুটনাংকের মত হয় তাহলে তরল পদার্থ শেষ পর্যন্ত জলীয় বাষ্পতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু জল যখন ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন ঠিক হিমাংকের কাছাকাছি অবস্থায় এসে তার সম্প্রসারণ ঘটে। আবার বরফ যখন গলতে শুরু করে তখন প্রথমেই ঘটে সংকোচন তারপর তাপ

বাড়ালে আবার সম্প্রসারণ ঘটে। ৪° সেন্টিগ্রেডে জলের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

প্রকৃতির রাজ্যে আমরা যে জল পাই তা কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। নানা ধরনের খনিজ পদার্থ গ্যাস ও জৈব বস্তু জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

বিজ্ঞানীরা জলকে H_2O বলেন কেন?

জল ছাড়া প্রাণী বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের এই পৃথিবীতে জলের কোনো বিকল্পও নেই। এই কারণেই জলের অপর নাম জীবন।

রসায়নবিদরা কিন্তু জলকে একটি সংকেত চিহ্ন দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা জলকে বলেন, H_2O. H বর্ণটি হলো হাইড্রোজেনের, O বর্ণটি হলো অক্সিজেনের অর্থাৎ হাইড্রোজেন অক্সিজেনে মিলে-মিশে জল উৎপন্ন করে।

প্রতিটি ভাষায় নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এই বর্ণমালার সাহায্য নিয়ে শব্দ গঠন এবং শব্দগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাক্য গঠন করা হয়। তেমনি আমাদের বাহ্য জগৎ-এ রয়েছে অনেক মৌলিক পদার্থ এবং প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের আলাদা আলাদা সংকেত চিহ্ন দিয়েছেন রসায়নবিদরা। যেমন,

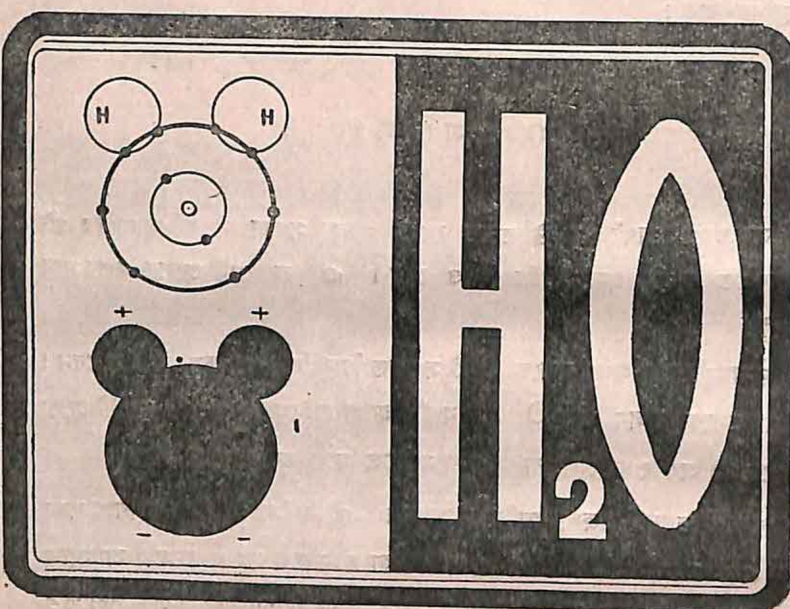
H—হাইড্রোজেন; He—হিলিয়াম; C—কার্বন; Cl—ক্লোরিন; Na—সোডিয়াম; Fe—লোহা; Zn—দস্তা ইত্যাদি।

এই সব মৌলিক পদার্থগুলি কখনও একা একা থাকে আবার কখনও অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলে-মিশে তৈরী করে নানা ধরনের যৌগিক পদার্থ। আমাদের পৃথিবীতে বহু বিচিত্র যৌগিক পদার্থ রয়েছে। জল হলো যৌগিক পদার্থ, কেননা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে-মিশে উৎপন্ন হয়েছে জলের।

হাইড্রোজেন সব চেয়ে হালকা গ্যাস কিন্তু অক্সিজেন বেশ সক্রিয়। অক্সিজেনে হাইড্রোজেন গ্যাস পোড়ালে জল তৈরী হয়। মিলনের এই ধরনকে বলে রাসায়নিক

বিক্রিয়া। কিন্তু রসায়নবিদরা বলছেন, মিলনের একটা নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনটা সহজ ধরনের নয়।

যে-কোনা পদার্থের ক্ষুদ্রতম আন্তিক কণাকে বলে পরমাণু। পরমাণুরা মিলে হয় অণু। অণুরাই মিলে-মিশে পদার্থের রূপ দেয়। রাসায়নবিদ্‌রা বলছেন,



জলের সংকেত চিহ্ন

পরমাণুরা কিন্তু নির্বিচারে এলোমেলোভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারে না। প্রতিটি পদার্থের পরমাণুরা অন্য পদার্থের পরমাণুদের সঙ্গে আনুপাতিক হারে মিলিত হয়। পাকাপাকিভাবে এই যে আনুপাতিক হার পদার্থের মেলবন্ধনে বর্তমান থাকে তা প্রকৃতি রাজ্যের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ঘটছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলতে সক্ষম। আর এটাই হলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর মিলনের আনুপাতিক হার।

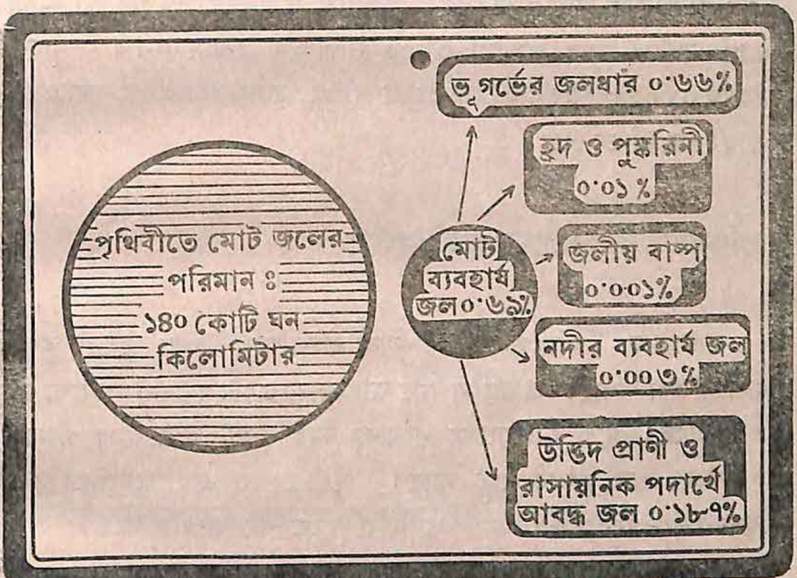
জল যৌগিক পদার্থ এবং জলের নিজস্ব ধর্ম আছে। জলের প্রত্যেক অণুতে জলের ধর্ম থাকবেই, কিন্তু তাতে না থাকবে হাইড্রোজেনের ধর্ম, না থাকবে

অক্সিজেনের ধর্ম। এক হিসাবে জলের পরমাণু নেই, কেননা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন করেছে জল।

জলের সংকেত চিহ্ন তাই H_2O.

কত জল আছে পৃথিবীতে?

জল আছে বলেই আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের লীলা চলছে। পশুপাখি থেকে গাছ-গাছালি জল ছাড়া বাঁচতে পারত না। অবশ্য মানুষের জীবন ধারণের কথাটাও বাদ পড়ছে না। আসলে জল ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। তাছাড়া পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে জল। উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী জল



মোট জলের হিসাব

বিভিন্ন রূপ নিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। তাই জলের আর এক নাম জীবন।

পৃথিবীতে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। জল আছে সমুদ্রে-হ্রদে, জল আছে নদী-নালা ও খাল-বিলেতে। পর্বতের চূড়ায় জল রয়েছে তুষার হয়ে,

উত্তর দক্ষিণ মের্তে বরফ হয়ে। আবহমণ্ডলে জল মেঘ হয়ে রয়েছে। স্থল-ভাগের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তুষারে-বরফে ঢাকা আর অর্ধেকটা জলীয় বাষ্প র্পে মেঘ হয়ে রয়েছে। অবশ্য মেঘ না থাকলেও আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্প থাকবেই।

পৃথিবীতে এই জলের মোট পরিমাণ হলো ১৪০ ঘন কিলোমিটার। এই বিপুল জলরাশির ৯৭ ভাগই হলো সমুদ্রের লোনা জল। সরাসরি সমুদ্রের লোনা জলকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। অন্য দিকে মেরুঅঞ্চলে যে জল বরফ হয়ে রয়েছে তার পরিমাণ হলো ২'৩১ ভাগ। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর মোট জলরাশির মধ্যে মানুষ শতকরা এক ভাগের চেয়ে কম জল ব্যবহার করতে পারছে ; হিসাবের অঙ্কে দাঁড়ায় ০'৬৯।

মানুষ যে জল ব্যবহার করছে তার বেশীর ভাগটাই রয়েছে মাটির তলায়, এবং এর পরিমাণ হলো ০'৬৬ ভাগ। হ্রদ আর সরোবরে রয়েছে শতকরা ০'০১ ভাগ, নদীতে আছে শতকরা ০'০০৩ ভাগ, আর বাতাসে জলীয় বাষ্পরূপে রয়েছে ০'০০১। বাদ বাকী জল রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থে ও প্রাণী এবং উদ্ভিদ দেহে।

পৃথিবীতে কত ধরনের জল আছে ?

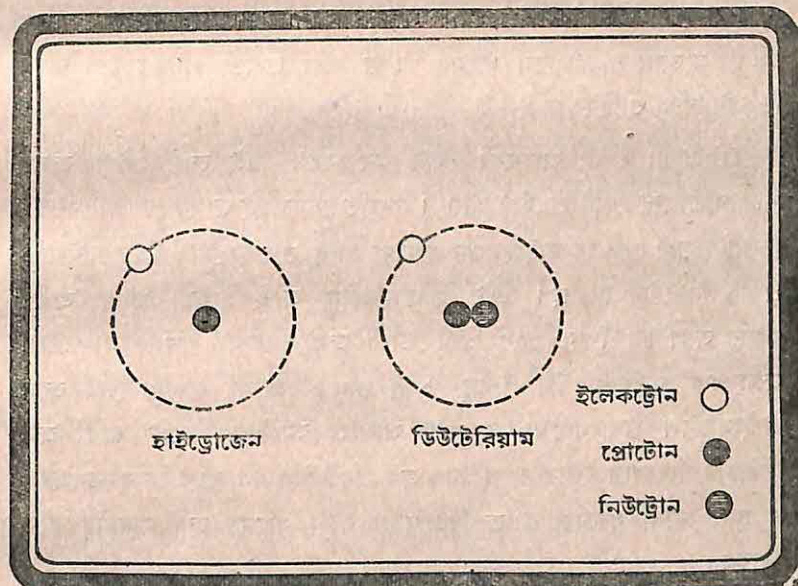
হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মেলবন্ধন ঘটলে জল উৎপন্ন হয়। অবশ্য রসায়নবিদরা বলেছেন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের একটা নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার আছে। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেনের পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। নির্বিচারে ও এলোমেলোভাবে তারা কখনও পরস্পরের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়তে পারে না।

পৃথিবীতে জলের রকমফেরের কথা তুললেই রাসায়নবিদরা বলবেন, পরমাণুর অন্দরমহলের খবর জানা না থাকলে এটা বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং জলের রকমফের জানতে ও বুঝতে গেলে পরমাণুর অন্দরমহলের খোঁজ-খবর আমাদের নিতেই হবে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটোন আর প্রোটোনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ইলেকট্রোন। প্রোটোনে রয়েছে

পসিটিভ চার্জ আর ইলোকট্রোনে রয়েছে নেগেটিভ চার্জ। পসিটিভ-নেগেটিভে মিলে পরমাণু হয়ে যাচ্ছে নিউট্রাল অর্থাৎ তড়িৎ-বিহীন। পরমাণুর ওজনের প্রায় সবটাই প্রোটোনে রয়েছে। পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটোন ছাড়াও আর এক ধরনের কণা দেখতে পাওয়া যায়। এই কণাকে বলে নিউট্রোন। নিউট্রোনের কোনো চার্জ নেই তবে তাদের ভর বা ওজন প্রোটোনের সমান।

রসায়নবিদরা মৌলিক পদার্থের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাকে বলে "পর্যায়-সারণী"। এই "পর্যায় সারণীতে" মৌলিক পদার্থের বিন্যাসটি লক্ষ্য করার মত। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটোনকে এক ধরে পরপর মৌলিক পদার্থের প্রোটোনের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে ; অবশ্য



জলের প্রকারভেদ

পদার্থগুলির গুণ ও ধর্ম যেখানে একই ধরনের সেখানে তাদের লম্বালম্বিভাবে রাখা হয়েছে। সুতরাং যে-যে পদার্থের যেমন যেমন প্রোটোন সংখ্যা তার তেমন পারমাণবিক সংখ্যা। যেমন, হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি প্রোটোন এবং অক্সিজেনের পরমাণুতে আটটি প্রোটোন ; অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১ এবং অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮। কিন্তু প্রত্যেক পরমাণুতে

যটা করে প্রোটোন থাকবে ঠিক ততটাই থাকবে ইলেকট্রোন, তা'নাহলে পরমাণু তড়িৎ-বিহীন হবে না।

দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের কতকগুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায়, অথচ পারমাণবিক সংখ্যা একই থাকে। এই ওজন বেড়ে যাবার কারণ হলো ঐ নিউট্রোন কণার অস্তিত্ব। এই ধরনের পরমাণুর সমবায়ে তৈরী পদার্থকে ঐ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে। এই আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন পরিবর্ত্তিত হলেও ঐ মৌলিক পদার্থের সব রকম রাসায়নিক ধর্ম বজায় থাকে।

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিজাত তিন রকমের হাইড্রোজেন আইসোটোপ খুঁজে পেয়েছেন এবং এদের প্রত্যেকটাই অক্সিজেনের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং আমরা তিন ধরনের জলের কথা ভাবতে পারি: প্রোটিয়াম, ডিউটোরিয়াম ও ট্রিটিয়াম জল।

প্রোটিয়াম জলই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই জলে হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন্দ্রে একটি প্রোটোন আছে। প্রকৃতি-রাজ্যে এই জলের প্রাধান্য বেশী। ডিউটোরিয়াম জলে যে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তার কেন্দ্রে একটি প্রোটোন ও একটি নিউট্রোন রয়েছে। এই ডিউটোরিয়াম জলই হলো ভারি জল। কলের জলে টন পিছু ১৫০ গ্রাম ভারী জল থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলে এর পরিমাণ টন পিছু ১৬৫ গ্রাম। আসল কথাটা হলো জলে আইসোটোপ উপাদনগুলি সবখানেই আলাদা আলাদা। এই ভারী জল নিউক্লীয় রিয়েক্টরে ইউরেনিয়াম বিভাজক নিউট্রোন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া নানা ধরনের কাজে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জল ব্যবহার করে থাকেন।

হাইড্রোজেন আইসোটোপ ছাড়া অক্সিজেন আইসোটোপও পাওয়া যায়। ফলে, বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রকৃতিজাত বিভিন্ন ধরনের জল তো পাওয়া যাচ্ছেই, এমন কি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আইসোটোপ তৈরী করে জলের যে বিভিন্ন নমুনা দিচ্ছেন তাতে সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর ভাবে।

বিজ্ঞানীদের কথামত নানা ধরনের জলের নমুনা একশর ওপর উঠে যেতে পারে।

খর জল কাকে বলে?

জলের কোনো স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই। জল যৌগিক পদার্থ। খুব হালকা গ্যাস হাইড্রোজেনের সঙ্গে তার চেয়ে সক্রিয় গ্যাস অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। তাছাড়া অন্যান্য পদার্থের মত জলের তিনটি রূপ ঃ তরল, কঠিন ও জলীয় বাষ্প।

কিন্তু জলের ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, প্রকৃতিরাজ্যে জল কখনও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই জলের মধ্যে অজৈব ও জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলেই জলের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না। এই জলকে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা হয় তাহলে জলের কোনো স্বাদই থাকবে না। কিন্তু আমারা সবাই জানি যে জলের একটা স্বাদ আছে ; অন্ততঃ জল খেলেই তা বুঝতে পারা যায়। যেহেতু জলের মধ্যে নানা ধরনের খনিজ পদার্থ গুলে থাকে সেই জন্যেই এই স্বাদ পাওয়া যায়। এমনকি বৃষ্টির যে জল তাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয় ; কেননা বৃষ্টি পড়ার সময়ে আবহমণ্ডলের নানা ধরনের গ্যাস জলের সঙ্গে মিশে যায়।

সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহের বিভিন্ন লবণ জলে দ্রবীভূত থাকে। তাই দেখা যায় এই জলে সাবান গুললে ভাল ফেনা হয় না। সাবানের সঙ্গে এই লবণগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ; ফলে সাবানের ফ্যাটি-অ্যাসিডের অদ্রাব্য ধাতব লবণ উৎপন্ন হয়। এই কারণেই সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। এ ধরনের জলকেই বলে খর জল।

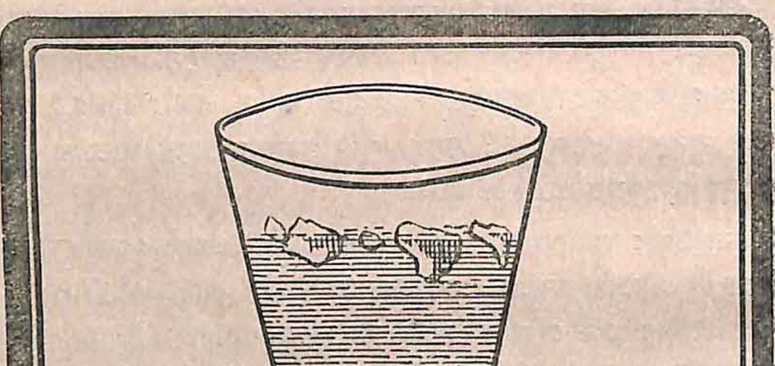
খর জল দু'রকমের। যে জলের মধ্যে বাই-কার্বোনেট লবণ দ্রবীভূত থাকে তার স্থায়িত্ব অল্প। কেননা এই ধরনের খর জলকে যদি ফুটোনো যায় তাহলে বাই-কার্বোনেট লবণ বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হয়ে বেরিয়ে যায়, আর অদ্রাব্য কার্বোনেট লবণ জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে। এই ধরনের খর জলকে প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে মৃদু জলে পরিণত করা যায়, তখন সাবান গুললে যথেষ্ট ফেনা বেরুবে।

আরও এক ধরনের খর জল আছে। এই জলে ধাতব সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকে এবং তাকে সহজে মৃদু জলে পরিণত করা যায় না। সুতরাং এই ধরনের খর জলের স্থায়িত্ব খুব বেশী। এই ধরনের খর জলেকে মৃদু জলে

পরিণত করতে হলে প্রথমে ওয়াশিং সোডা মিশিয়ে নিতে হয়। ফলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাতে অদ্রাব্য কার্বোনেট লবণ উৎপন্ন হয় এবং তা পাত্রের তলায় জমা হয়। এর ফলে যে জল পাওয়া যায় তা যথেষ্ট মৃদু, অর্থাৎ এই জলে সাবান গুললে উপযুক্ত ফেনা বেরুবে। যে-কোনো ধরনের খর জল হোক না কেন উপযুক্ত পরিমাণে জিওলাইট মিশিয়ে বেশ ভালোভাবে ফোটালে তার খরতা দূর হয়ে যায়।

বরফ জলে ভাসে কেন ?

জলের কঠিন রূপ হলো বরফ। উষ্ণতা যখন খুবই কমে আসে তখন তরল জল বরফে রূপান্তরিত হয়। O° সেন্টিগ্রেডে তরল জল বরফ হয়। কিন্তু



জলে ভাসমান বরফ

জলের মেজাজটা এমনই ধরনের যে জল যত ঠাণ্ডা হবে ততই সে আয়তনে বাড়বে। আবার গলতে শুরু করলে তার আয়তন কমে যাবে।

কোনো ধাতু গলিয়ে যদি সেই ধাতুরই কঠিন একটা টুকরো তাতে ফেলে

দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সেই টুকরোটা তলিয়ে যাচ্ছে। কেননা কঠিন অবস্থায় যে কোনো পদার্থের ঘনাঙ্ক তার তরল অবস্থার থেকে বেশী। অথচ বরফ ও জলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। সুতরাং বরফ গলে যাচ্ছে এটা যত সহজ বলে ভাবা যাক্‌না কেন, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই বিস্ময়কর।

যে কোনো কঠিন পদার্থই গলতে শুরু করলে প্রসারিত হয় বা আয়তনে বাড়তে থাকে। কিন্তু গলানো জলের আচরণ একেবারে আলাদা। জল গলতে শুরু করলেই প্রথমেই তার সংকোচন ঘটবে অর্থাৎ গুটিয়ে আসবে। কিন্তু উষ্ণতা আরও বাড়াতে থাকলে এমন একটা সময় আসবে যখন জল আবার প্রসারিত হবে অর্থাৎ আয়তনে বাড়বে। রসায়নবিদরা বলছেন জল অণুদের এটা অন্যন্যসাধারণ মেজাজ, যা অন্য কোনো পদার্থের নেই। জলের এই বিশেষ প্রবণতাটি দেখে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

O° সেন্টিগ্রেডের ওপর ৪° উষ্ণতায় জলের এই মেজাজটি লক্ষ্য করা যায়। এই ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনাঙ্ক সব চেয়ে বেশী। তাহলে ৪° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা থেকে জলকে যত O° সেন্টিগ্রেডের উষ্ণতায় আনা হবে ততই সে আয়তনে বাড়বে অর্থাৎ তার ঘনাঙ্ক কমবে। O° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বরফের ঘনাঙ্ক জলের ঘনাঙ্কের চেয়ে কম। এই কারণেই বরফ হলো জলের চেয়ে হালকা।

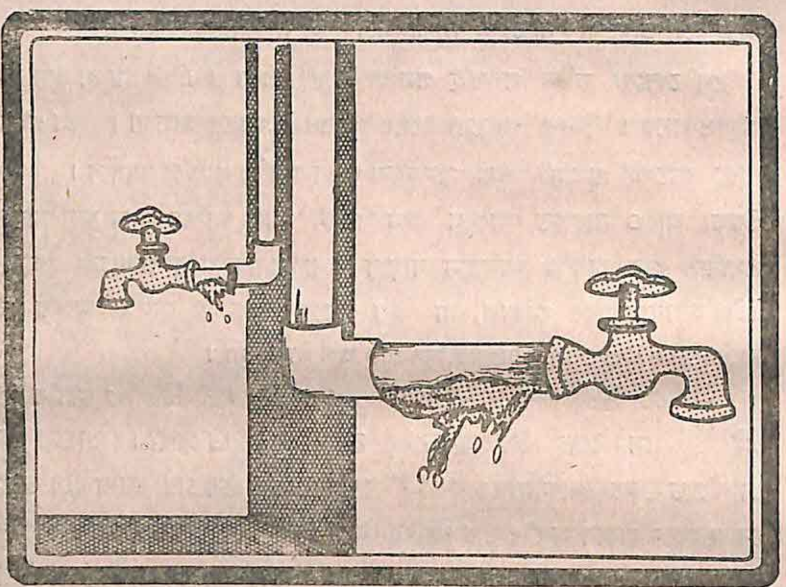
আর এই কারণেই জলে বরফ ভাসতে থাকে।

প্রচণ্ড শীতে জলের পাইপ ফেটে যায় কেন ?

O° সেন্টিগ্রেডে তরল জল বরফে পরিণত হয়। জল অণুদের পারস্পরিক আকর্ষণের ধরনটা এমনই যে O° সেন্টিগ্রেড থেকে যখন ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পৌঁছোয় তখন জলের সংকোচন ঘটে অর্থাৎ আয়তনে কমে। এই অবস্থায় জলের ঘনাঙ্ক সব থেকে বেশী। আবার ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা থেকে যখন O° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পৌঁছোয় তখন জলের সম্প্রসারণ হয় অর্থাৎ আয়তনে বাড়ে। এই অবস্থায় জলের ঘনাঙ্ক কম হয়।

৪° সেন্টিগ্রেড থেকে O° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পৌঁছোতে জলের সম্প্রসারণ ঘটে বলেই পাথুরে ফাটলে বরফ জমে জমে বড় বড় পাথরের মধ্যে চিড় ধরিয়ে দেয়,

এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ফাটিয়ে দেয়। পাহাড়-পর্বতে ফাটল ধরে শেষ পর্যন্ত তা যে ভেঙে ভেঙে পড়ে তার কারণ জলের বরফ দশায় পেঁাছোনোর জন্যে। ফিনল্যাণ্ডের কোয়ারিতে কার্যরত শ্রমিকরা পাথরের ফাটলে ফাটলে জল ঢেলে



ঠাণ্ডায় জলের পাইপের অবস্থা

দেয়। সেই জল যখন বরফে পরিণত হয় তখন বড় বড় পাথরের চাঙাড় ফেটে যায়। শ্রমিকদের কাজের লাঘবও হয়।

যে সব অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে সেখানে জল স্বভাবতই বরফে পরিণত হয়। কিন্তু যে-সব জলের পাইপ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জল সরবরাহ করা হয়, সেখানে শীতের দিনে অনেক পাইপে বরফ জমে যায়। কারণ ঐ একটা; অর্থাৎ 4° সেন্টিগ্রেড থেকে জল বরফে পরিণত হলে তার আয়তন বাড়ে। এই আয়তন বাড়ার জন্যেই জলের পাইপ ফেটে যায়।

হিমবাহ সঞ্চরণশীল কেন?

পৃথিবীর বহু জায়গায় হিমবাহ দেখা যায়। সচরাচর যেটা দেখা যায় তাকে বলে "উপত্যকার হিমবাহ"। আল্‌প্‌স পর্বতে কমপক্ষে ১২০০র মত

"উপত্যকার হিমবাহ" রয়েছে। দক্ষিণ আলাস্কা পর্বতে এই ধরনের হিমবাহ রয়েছে ১০,০০০-এর মত।

তুষার-ঢাকা পর্বত থেকে এই ধরনের হিমবাহ বড় বড় বরফের নদীর মত এঁকে-বেঁকে নামতে থাকে। যে-সব উপত্যকার গড়নটা অনেকটা বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চের মত এবং যাদের দেওয়ালগুলো খাড়া সেখানেই জমা হতে থাকে তুষার স্তূপ। আর এটাই হলো হিমবাহদের উৎস। এই খানেই জমা হতে



হিমবাহ

থাকে ঝড়-খাওয়া তুষার অথবা পর্বতের গা থেকে ধ্বসে পড়া বরফ ও তুষার মোড়া বড় বড় পাথর। গ্রীষ্মের সময়ও কিন্তু এরা গলে যায় না বরং বছরের পর বছর এরা ঘন হয়ে জমতে থাকে॥

তুষারের স্তর এইভাবে জমতে থাকলেও পরিবর্তনটাও ঘটে যায় ধীরে ধীরে। তলার দিককার স্তরে চাপটা পড়ে অত্যন্ত বেশী। ফলে বরফের দানাগুলো ভেঙেচুরে গিয়ে কঠিন বরফে পরিণত হয়। কিন্তু হিমবাহের তলার চাপটা যদি প্রবল হয় তাহলে তুষার গলতে শুরু করবে। এমনকি উষ্ণতা হিমাঙ্কের তলায় থাকলেও তুষার গলার কাজটা চলতে থাকবে। যদি এই হিমবাহ ঢালু জায়গা

পায় তাহলে নিচের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকবে। বিরাট বিরাট বরফের চাঙাড় নিয়ে তুষার নদীর মত এ'কে বে'কে চলতে শুরু করবে এই হিমবাহ। নদীর মত চলার ছন্দ আছে বলেই হিমবাহ পাথর, মাটি প্রভৃতি সব কিছুকেই টানতে টানতে নিয়ে চলে।

এই হিমবাহ নিচে নামবার সময় যখন তুষার অঞ্চলের ওপর দিয়ে চলতে থাকে, তখন সামনের দিকটা ধীরে ধীরে গলতে থাকে। হিমবাহের চলনের সঙ্গে এই গলন যদি তাল রেখে চলতে পারে তাহলে সামনের দিককার সীমানা উপত্যকার ঠিক একই জায়গায় থাকবে ; অর্থাৎ চলনে-গলনে মিলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে। কিন্তু হিমবাহের চলন যদি গলনের পিছু পিছু হয় তাহলে হিমবাহের সামনের সীমানা উপত্যকার দিকে পিছু হটবে।

দক্ষিণমেরু অঞ্চল তো বরফের টুপি মাথায় দিয়ে দিন-রাত কাটাচ্ছে। প্রকান্ড যে বরফের মোটা আস্তরণ তা আর কিছুই নয়, তা হলো হিমবাহ। এগুলোকে বলে মহাদেশীয় হিমবাহ। বরফে ঢাকা গ্রীণল্যান্ড হলো তার একটা বড় নজীর। এই হিমবাহ উপত্যকার আদল বদলে দেয়। এইসব উপত্যকাদের দেখতে হয় U-এর মত ; নদীর ছন্দে তোলা উপত্যকা V থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

মেরু অঞ্চলের হিমবাহ কিন্তু গলে না গিয়েই সমুদ্রে পড়ে। বিরাট বরফের চাঙাড় তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকে, এরাই হলো হিমশৈল।

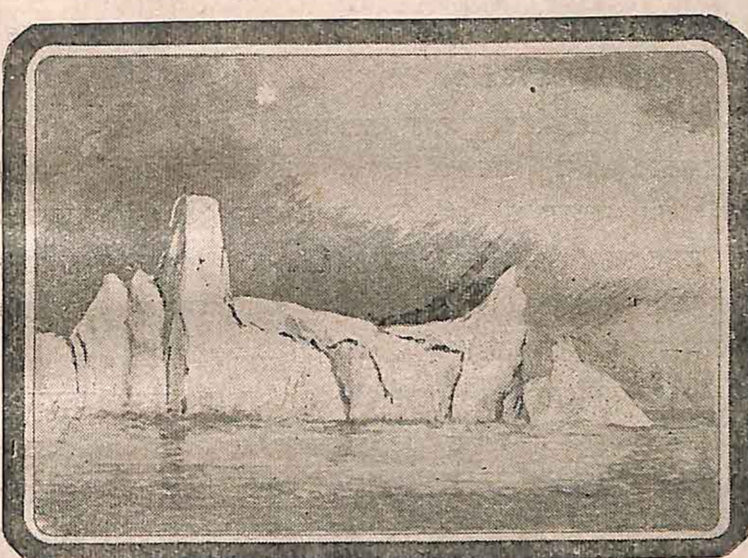
গত ১০,০০০ বছর কিম্বা তার চেয়ে বেশী হলো যখন হিমবাহ পিছু হঠছে। 'হিমবাহ যুগের' তুলনায় এখন এদের অস্তিত্ব খুবই অলপ। বর্ত্তমানে পৃথিবীর আবহাওয়া এতই উষ্ণ হয়েছে যে হিমবাহের অস্তিত্ব কমে আসছে।

হিমশৈল কি ?

১৯১৪ সালের ১৪ই এপ্রিল রাতের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বিশালাকার যাত্রীবাহী জাহাজ 'টাইটানিক' হিমশৈলের আঘাতে জলমগ্ন হয়, ১৫১৩ জন যাত্রী প্রাণ হারায় এইদুর্ঘটনায়। বিশেষজ্ঞরা

এই দুর্ঘটনার নানা সম্ভাব্য কারণ দেখান। বলা হয়েছিল, কুয়াশার জন্যে ক্যাপ্টেন ঐ বিশাল হিমশৈলটি ঠিক সময় মত দেখতে পান নি ; তাই ঘটে সংঘর্ষ, 'টাইটানিক' জলমগ্ন হয়।

এই বেদনাবহ ঘটনাটিকে রসায়নবিদরা অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে বলেছেন জলের খেয়ালীপনার জন্যই টাইটানিক জাহাজের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটেছিল।



হিমশৈল

বরফের তৈরী বিস্ময়কর, বিশাল, ভয়ঙ্কর এই হিমশৈল জলে ভেসে চলতে পারে অনায়াসে। আবার হাজার টন ওজন নিয়ে এই হিমশৈল সোলার মত জলে ভাসতে ভাসতে চলে।

হিমবাহ থেকে বিরাট বিরাট বরফের চাঙাড় তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তারা চলতে চলতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। হিমবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় বলে এই বড় বড় চাঙাড়গুলো জলে ভাসতে ভাসতে চলে।

হিমবাহ অনেক সময় সরাসরি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে না। সমুদ্রের মুখের কাছে এসে একটা পথ সৃষ্টি করে দেয়। দু'পাশে খাড়া খাড়া বরফ-জমা দেওয়াল তুলে দেয়। নরওয়ে ও গ্রীণল্যাণ্ডে এমন ধরনের সংকীর্ণ সমুদ্র সৈকতের চেরা

মুখের দুপাশে হিমবাহের জমাট বরফ দেখতে পাওয়া যায়। হিমশৈলরা এই বরফের চাঙাড় ভেঙে বেরিয়ে এসে সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকে। অনেক সময় সমুদ্রের ঢেউ-এ আঘাত খেতে খেতে হিমবাহের স্তূপ গলে গিয়ে চেটালো হয়ে পড়ে থাকে জলের তলায়। এগুলোও আবার ভেঙে ভেঙে মাঝে মাঝে হিমশৈল হয়ে ভাসতে ভাসতে চলতে শুরু করে। হিমশৈলদের আকার বিরাট। যেগুলো সাধারণভাবে ছোটো তারা ২০ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে ১০০ ফুটের মত হিমশৈলদের নমুনা খুবই বেশী। তবে এমন হিমশৈলও রয়েছে যারা ২৭০০ ফুটের মত।

হিমশৈলের বরফ সমুদ্রের জলের চেয়ে কিছুটা হাল্কা। তাই হিমশৈল সমুদ্রের জলে ৯ ভাগের ৮ ভাগ ডুবে থাকে। বলতে পারা যায় বেশীটাই থাকে জলের মধ্যে। সুতরাং যে হিমশৈল সমুদ্রতল থেকে ১৫০ ফুট উঁচুতে তার তলাটা রয়েছে প্রায় ১০০০ ফুট জলের তলায়। একটা হিমশৈলতে কত যে বরফ তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। বিস্ময়ের হলেও একটা হিমশৈলের ওজন প্রায় ২০ কোটি টনের মত হতে পারে!

হিমশৈলের বেশীর ভাগ অংশটা যেহেতু জলের তলায়, সেই জন্যে বাতাসের দাপটে হিমশৈল চলে না, শুধু সমুদ্রের স্রোতে তাদের গতি, তাদের চলন। তবে শেষ পর্যন্ত এই সব হিমশৈলরা কম উষ্ণতা বিশিষ্ট অক্ষাংশের দিকে চলে যায়, গলতেও থাকে। এই হিমশৈল জাহাজের কাছে মৃত্যুদূত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা ঘেঁসে পাহারা দেবার ব্যবস্থা নেওয়া আছে হিমশৈলদের গতিবিধি অনুসন্ধান করার জন্যে।

হিমশৈলের জ্যামিতিক ছাঁদ মাধুর্যপূর্ণ। প্রভাতী সূর্যের আলোয় তাদের দেহে রঙ-এর ঢেউ তোলে যেমনটি দেখা যায় অস্ত সূর্যের আলোতে। তাছাড়া ধপ্‌ধপে সাদা হিমশৈলের বুকে সবুজ ও হাল্কা নীল রঙ মাঝে-মধ্যে আলপনা এঁকে যায়।

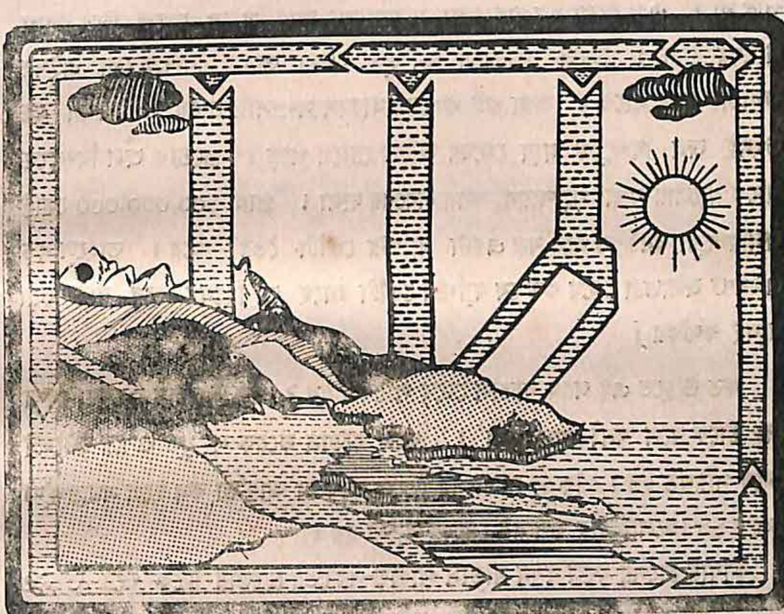
এ বিস্ময়ের ভাষা নেই।

মেঘসৃষ্টি হয় কেন?

সূর্যের ঝল্‌মলে আলো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, রাতের তারারা মুখ লুকোয় মেঘের আবরণে। এই মেঘ রাশ রাশ পেঁজা তুলোর মত মাথার ওপর দিয়ে

উড়ে চলে। প্রভাতী ও অস্ত সূর্যের আলোয় মেঘের বুকে রঙ ধরায়। আবার এই মেঘ থেকেই বৃষ্টি নামে—জল পড়ে।

জলের কণা দিয়ে মেঘ তৈরী হয়। এই জল আসে খাল-বিল, হ্রদ, নদী-সাগর ও অন্যান্য জলীয় পদার্থ থেকে। জল আসে বটে পৃথিবীর বুক থেকে কিন্তু বাতাসে মিশে গিয়ে জলকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। সবটাই ঘটে



বাষ্পীয়ভবন

কিন্তু সূর্যের তাপ অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যে। এটাই হলো বাষ্পীয়ভবন। জলের কণারা মিলে যে গ্যাস তৈরী করে তা-ই হলো জলীয় বাষ্প। জল থাকে বলেই বাতাস ভিজে-ভিজে হয়।

বাতাস যখন গরম থাকে তখনই জলের অণুগুলো আরও দূরে দূরে চলে যায়। আর যত হাল্কা হয় ততই ওপরে ওঠে জলের অণুরা। কিন্তু যতই ওঠে ততই এরা ঠান্ডা হতে থাকে। প্রতি ৩০০ ফুট উঠতে ১° ফারেনহাইট উষ্ণতা কমতে থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের দিনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা যখন ৮০° ফারেনহাইট, তখন ১৫০০ মিটার ওপরে জল অণুদের উষ্ণতা দাঁড়ায় ৬৩° ফারেন-হাইট। ওপরের ঠান্ডা বাতাস গরম বাতাসের মত অত বেশী জল অণুদের ধরে

রাখতে পারে না। শুরু হয় ঘনীভবনের পালা। জলীয় বাষ্পের অণুগুলো বিন্দু বিন্দু জলের কণাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তোলে। শীতের দিনে মুখ দিয়ে বড় গোছের হাই তুললে যেমন এক রাশ ধোঁয়া দেখা যায়, ঘনীভবনের ফলে জলীয় বাষ্প তেমনি বিন্দু বিন্দু জল কণা নিয়ে জড়ো হয়।

বাতাসে মিশে থাকে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যাদের আমরা খালি দেখতে পাই না। এরা হলো ধুলোর কণা, পুষ্পরেণু আর সমুদ্র থেকে উঠে আসা লবণের দানা। ভিজে বাতাসে ঘনীভূত হওয়া জলের বিন্দুগুলো এইসব কণাদের সঙ্গে থাকে। যখন ওই ওপরের বাতাস সম্প্রসারিত হয় ও ঠাণ্ডা হয় তখনই জল বিন্দুতে গড়া মেঘের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। প্রত্যেক জল বিন্দুতে থাকে ধুলোর কণা, পুষ্পরেণু আর লবণের দানা। প্রায় ১০০,০০০,০০০ ছোট্ট জলবিন্দুরা ঘনীভূত হয়ে বড় একটা বৃষ্টির ফোঁটা তৈরী করে। তাহলে বড় একখণ্ড জলাভরা মেঘে কত যে বৃষ্টির ফোঁটা আছে তা হিসেব কষে বার করা খুবই কষ্টকর।

কত উঁচুতে এই গরম বাতাস মেঘে পরিণত হয়? যে উচ্চতায় মেঘেরা দেখা দেয় তাকে বলে 'ঘনীভবনের স্তর'। ভিজে বাতাস কয়েক শ' ফুট ওপরে উঠলেই মেঘে পরিণত হয়। কিন্তু বাতাসের ভিজে ভাব বা আর্দ্রতা কম হলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১ কিলোমিটার ওপরেই মেঘের সৃষ্টি হয়।

আবার চাপের ফলে যখন বাতাস পাহাড়-পর্বতের চূড়োর দিকে ওঠে তখনও মেঘ সৃষ্টি হয়। এই মেঘের দল যখন পাহাড়-পর্বতের গা বেয়ে চলতে শুরু করে তখনই ঘটে বৃষ্টিপাত, সুতরাং পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যাবার সময় মেঘ আবার হারিয়ে ফেলে জলকণাদের। এই কারণেই দেখা যায়, পাহাড়-পর্বতের এক দিকের অঞ্চলে যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তখন অপর পারের অঞ্চল থাকে ঘটখটে, শুকনো।

সব মেঘেরাই জলকণা দিয়ে সৃষ্টি, কিন্তু সব জলভরা মেঘেই বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টির মেঘ জল দেবেই, আর এ'সব মেঘেদের আনাগোনা চলে কয়েক হাজার মাইল ধরে।

বৃষ্টির জন্যে যা দরকার তা হলো, হয় গরম বাতাস ছুটবে ভিজে বাতাসের দিকে, না হয় ভিজে বাতাস ছুটবে গরম বাতাসের দিকে। যখন গরম বাতাস দলা পাকিয়ে জলভরা মেঘে পরিণত হয় তখন গরম বাতাসের পাকানো-প্যাচানো

দলা ঠাণ্ডা বাতাসের আওতায় এসে ঠাণ্ডা হয়—অর্থাৎ ঘণীভূত হয়, তখনই বর্ষণের পালা। দলা পাকানো বাতাসের গতিবিধি লক্ষ্য করেই আবহাওয়া কেমন হবে তা ঘোষণা করা হয়। বৃষ্টি হবে কি হবে না তা অবশ্যই ধরা পড়ে মেঘরাজ্যের আনা-গোনা দেখে।

আবহবিদরা বিভিন্ন ধরনের মেঘ দেখে আবহমণ্ডলের অবস্থা দেখেন। বিভিন্ন উচ্চতায় মেঘেদের নানা ধরনও আছে, যেমন অলক মেঘ, স্তর মেঘ ইত্যাদি।

কোথায় কোথায় সব থেকে বেশী বৃষ্টিপাত হয়?

পৃথিবীর কোন্ কোন্ এলাকায় কেমন ধরনের তুষারপাত কিম্বা বৃষ্টিপাত হবে তা মূলতঃ নির্ভর করে সেই এলাকা বিশেষের উষ্ণতা, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তাদের উচ্চতা এবং কোথায় কোথায় পর্ব্বত শ্রেণী রয়েছে তাঁর নিশানার ওপর। এসব ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ওপর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কতটা হবে তা নির্ভর করে। তবে ঋতু বদলের পালা একটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

হাউউ-এ বৃষ্টিপাতের দিনগুলোসবথেকে বেশী। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ১১৯৯ সেন্টিমিটারের মত। ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি-পাতের দিনসংখ্যা দ্বিতীয়। এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ১১৫০ সেন্টিমিটারের মত। চেরাপুঞ্জিতে কোনো এক সময়ে দেখা গিয়েছে মাত্র ৫ দিনে বৃষ্টিপাত হয়েছে প্রায় ৩৮১ সেন্টিমিটারের মত। ১৮৬১ সালে দেখা গিয়েছিল চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হয়েছিল প্রায় ২'২৯৯ সেন্টিমিটারের মত।

পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত তার হিসাব বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন। লণ্ডনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ৬১ সেন্টিমিটারের মত; ন্যুইয়র্কে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ১০২ সেন্টিমিটারের মত; প্যারিসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ৫৬ সেন্টিমিটারের মত। চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সঙ্গে অন্য জায়গার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনা করে পার্থক্যটা কতখানি তা সহজেই ধরা পড়ে।

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে শুকনো জায়গা হলো চিলির আরিকা। এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত হলো প্রায় ০'০৫ সেন্টিমিটার। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পার্থক্য নির্ভর করে আঞ্চলিক অবস্থা ও

ঋতুবদলের সময়ে। নিরক্ষবৃত্তীয় অঞ্চলে এবং যেখান দিয়ে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় সেই সব সমুদ্র সৈকত এলাকায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০০ সেন্টিমিটারের মত। দেখা গেছে, নিরক্ষবৃত্তের কাছাকাছি কিম্বা যে-সব এলাকা সমুদ্রের দিকে মুখ করে পর্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত সেই সব এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। আমাজনের উপত্যকা, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং ইস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপপুঞ্জে প্রবলভাবে বর্ষণ হয়। এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় হিসাব ২০০ সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশী।

নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ বরাবর ৩০° পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমতে থাকে। মরুভূমি অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৫ সেন্টিমিটার থেকে কম।

নিরক্ষরেখা বরাবর দুটি অঞ্চলের বায়ুস্রোত পরস্পরের সঙ্গে মিলতে থাকে। উত্তর গোলার্ধ থেকে যে বায়ুস্রোত আসে তা দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উঠে-আসা বায়ুস্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়। জলীয় বাষ্প নিয়ে যে গরম বাতাস প্রবাহিত হয় তা কিন্তু ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এই জোলো বাতাস যত ওপরের ঠাণ্ডা স্তরে ওঠে, জলীয় বাষ্পের বিরাট একটা অংশ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে।

শিলাবৃষ্টি কাকে বলে?

প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে তার ইয়ত্তা নেই। শিলাবৃষ্টির ঝড় প্রকৃতি রাজ্যের এমনই একটা বিস্ময়কর ঘটনা। এমন বেয়াড়াপনা ঘটনা প্রকৃতি জগতে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। শিলাবৃষ্টির ঝড় আমরা দেখেছি এবং শুনেছি। কত যে ক্ষয় ক্ষতি ঘটে শিলাবৃষ্টির ঝড়ে তার সঠিক হিসাব পাওয়া খুবই কষ্টকর। পশুপাখী, গাছপালা শস্য ক্ষেত এমনকি মানুষের জীবনেও শিলাবৃষ্টির ঝড় বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসে। গ্রীষ্মকালেই শিলাবৃষ্টির ঝড় হয়। শিল পড়ার অন্যতম সঙ্গীসাথীরা হলো মেঘের হুংকার, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি আর বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় শীতল স্তর অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু ঠাণ্ডার ধাক্কায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জমাট বেঁধে বরফের দানাতে পরিণত হয়।

একটা ছোট্ট বৃষ্টির ফোঁটাতে কতটুকু আর বরফের দানা হয় ? কিন্তু ঘটনাটা ঘটে খুবই মজার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জমে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট বরফের দানাতে পরিণত হয়ে যখন পৃথিবীর বুকে নামতে চায় তখন ওপরের দিকে উঠে আসা ঝোড়ো-বাতাসের দাপটে বরফের দানাগুলো আবার ওপরে উঠতে থাকে। পৃথিবীর ওপরের যে স্তর থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো নামে ঝোড়ো-বাতাসের ঠেলায়, বরফের দানাগুলো ঐ একই স্তরে এসে পোঁছোয়। নতুন বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো বরফের দানাগুলোকে জাপটে ঝরে। সুতরাং আবার যখন এরা নিচের দিকে নামতে থাকে তখন শীতল মণ্ডলের আওতায় এসে ফোঁটাগুলো জমাট বাঁধে, দানাগুলো বরফের নিয়ম অনুযায়ী আয়তনে বাড়ে। শেষ পর্যন্ত বড় বড় দানার বরফ বা শিলা মাটির বুক সাদা করে দেয়।

গ্রীষ্মের দিনে শিলাবৃষ্টি আনন্দের মেজাজও এনে দেয়। বরফের দানা-গুলোর আয়তন কতটা হতে পারে ? প্রথমেই মনে রাখতে হয় এই সব বরফের দানা নিচ-ওপর করতে করতে আকারে বেশ বড় হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঝোড়ো বাতাসের দাপট কাটিয়ে মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বিভিন্ন ওজনের শিলা আমরা দেখতে পাই, শুনেও থাকি। অনেক সময় একটা শিলার ওজন প্রায় ১ কিলোগ্রামের মত হয়।

জমাট বাঁধা বৃষ্টির ফোঁটাগুলোই হলো 'শিল' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা হলো বরফের টুকরো। আর শীতের দিনে হালকা ধরনের যে 'শিল' পড়ে তাকেই বলে তুষারপাত।

ঋতু বদলের সঙ্গে নামেরও বদল হয়ে যায় এই জমাট-বাঁধা জলের ফোঁটা-গুলোর। অবশ্য তুষারপাতের সময় আনুষঙ্গিক সঙ্গীসাথীরা থাকে না।

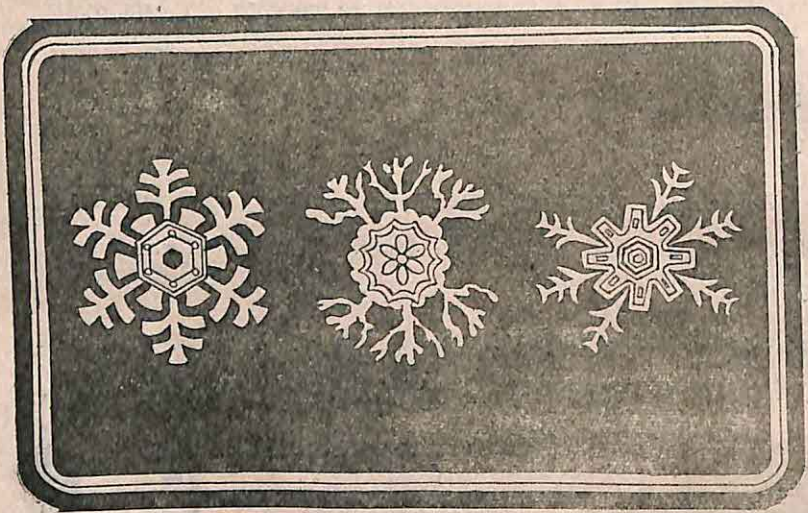
কাকে বলে তুষার ?

জলের তিন রূপ: কঠিন, তরল আর বাষ্পীয়। জলের কঠিন অবস্থাকেই বলে বরফ। তরল জলের উষ্ণতা 0° সেণ্টিগ্রেড হলেই জলের বরফ দশা। তুষার সৃষ্টি হয় এই তরল জল জমে গিয়ে। তবুও তুষারকে বরফ বলা হয় না।

জল জমে গিয়ে হয় স্ফটিক। এর অর্থ হলো জলের অণুরা এমন কৌশলে কৌশলে মেলে যাতে তারা গড়ে তোলে বিশেষ ছাঁদ অর্থাৎ জ্যামিতিক ধরনের আকার। জলের অণুদের বিশেষ বিন্যাসই হলো স্ফটিক। জলের তুষার রূপে থাকে নানা আঁশের নক্সা। প্রত্যেকটি আঁশের নক্সায় থাকে অনেকগুলো করে বরফের স্ফটিক। আলোর প্রতিফলনে স্ফটিকের তলগুলোকে সাদা দেখায়।

জলীয় বাষ্প যখন আবহমণ্ডলে গিয়ে জমাট বাঁধে তখনই তৈরী হয় তুষার। ছোট্ট ছোট্ট স্ফটিকগুলো এমন সুন্দরভাবে তৈরী হয় তখন তাদের দেখতে হয় খুবই পরিষ্কার আর স্বচ্ছ। বায়ুস্রোতের ধাক্কায় এইসব ছোট্ট ছোট্ট স্ফটিক-গুলো আবহমণ্ডলে ওঠা-নামা করে।

বাতাসের ঢেউ এ এই-সব স্ফটিক একটি কেন্দ্র তৈরী করে আসে-পাশে আরও স্ফটিক জড়ো করে নেয়। এমন একটা সময় আসে যখন একটি কেন্দ্রকে ঘিরে



স্নো-ফ্লেক

শতাধিক স্ফটিক পরস্পরের সঙ্গে নানা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যখন এই ধরনের স্ফটিকগুলো বেশ বড় বড় আকার নেয় তখন সেগুলো ভাসতে ভাসতে মাটিতে নামে। এই সব বরফের স্ফটিকগুলোকেই আমরা বলি 'স্নো-ফ্লেক' বা তুষারের আঁশ।

কোনো কোনো স্ফটিক চ্যাটালো ধরনের, কেউ কেউ বা ছুঁচের মত লম্বা। তবে তাদের আকার যেমন ধরনেরই হোক্ না কেন তুষার-স্ফটিকের থাকবে ছটা দিক বা কোণ। কোনো একটা বিশেষ তুষার-আঁশের নক্সায় কোন পার্থক্য থাকে না, যদিও ভিন্ন ভিন্ন তুষার-আঁশের আদলে নক্সার বুনুনি আলাদা হতে পারে। সুতরাং দুটো একই ধরনের তুষার-আঁশ দেখতে পাওয়া যায় না।

তুষার-আঁশের নক্সায় কোণ্ দেখতে পাওয়ার কারণ আছে। জল যৌগিক পদার্থ, অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে জলের উৎপত্তি। তবে মিলনের আনুপাতিক হার হলো হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণু আর অক্সিজেনের একটা পরমাণু। সুতরাং জল যখন স্ফটিক আকারের রূপ পায় তখন তার হয় তিনটে, না হয় ছ'টা কোণ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই নক্সা-তোলা তুষার-আঁশের অস্তিত্ব প্রকৃতি রাজ্যের একটা প্রকাণ্ড শিল্প-নমুনার নজীর।

তুষারের মধ্যে রয়েছে প্রচুর বাতাস, ফলে এরা মোটেই তাপ পরিবহন করে না। তাই তুষারের চাদর ঘুমন্ত শস্যের দানাদের রক্ষা করে, আবার তুষারের ইঁট দিয়ে তৈরী ঘরে মানুষ স্বচ্ছন্দে তার ভেতর গরমের স্বাদ পেতে পারে।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রঙের তুষারপাত হয়। নীল, সবুজ, লাল এমনকি কালো রং-এর তুষারপাত হতেও দেখা যায়। বাতাসে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক আর ধুলোর কণারা ভেসে বেড়ায়। তুষার সৃষ্টির সময় তাদের সক্রিয় উপস্থিতি এমনই বর্ণবাহারের রূপ ফুটিয়ে তোলে।

শিশির বিন্দু কি ?

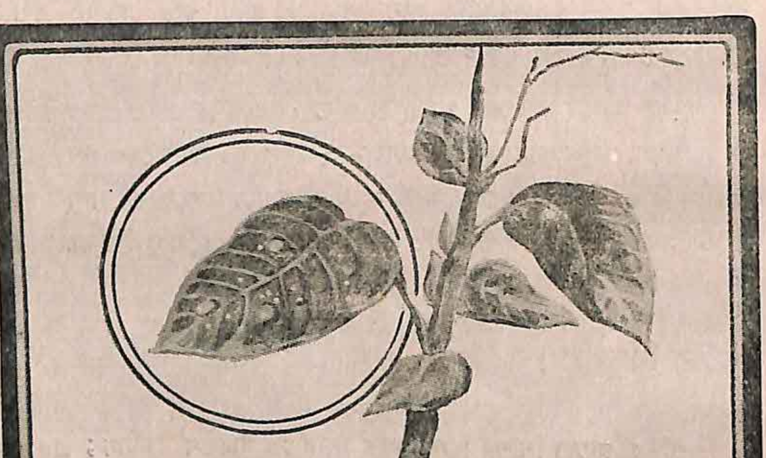
প্রকৃতির রাজ্যে শিশির বিন্দু অতি পরিচিত সাধারণ জিনিস ; এর রূপ বোঝা যায়, সুতরাং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে কোনো অসুবিধা পেতে হয় না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো শিশির বিন্দু নিয়ে নানা ধরনের ভুল ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে ছিল, হয়তো বা এখনও আছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই ধারণাটাই করে আসা হচ্ছে যে বৃষ্টিপাতের মত শিশিরপাতও হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বৃষ্টির মত শিশির পড়ে না। গাছের পাতায় ঘাসের ডগায় ধানের শীষে বিন্দু বিন্দু জলের কণাগুলোকে

আমরা শিশির বিন্দু বলেই জেনে আসছি। সুতরাং শিশির বিন্দু বলতে সত্যি সত্যি কি বোঝায় তা জেনে নেওয়া দরকার।

শিশির বিন্দু কি তা ভালোভাবে বুঝতে গেলে প্রথমেই আমাদের চারপাশের বাতাসের চরিত্রটা বুঝে নিতে হবে। বাতাস মাত্রেই জলীয় কণা থাকবে—তবে কম আর বেশী। সেই জন্যে বাতাসের একটা ভিজে ভাব বা আর্দ্রতা থাকে। তবে গরম বাতাস যতটা জলীয় কণাদের ধরে রাখতে পারে, ঠাণ্ডা বাতাস ততটা পারে না। এই বাতাস যখন ঠাণ্ডা স্তরে এসে পেঁছোয় তখন জলভরা বাতাসের কিছুটা ঘনীভূত হয়। জলীয় বাষ্পের কণারা ঠাণ্ডায় জলের বিন্দুতে পরিণত হয়। এই সব বিন্দু বিন্দু জলকণারা হলো শিশির বিন্দু।

ঠাণ্ডা স্তরের উষ্ণতা এমন ভাবে নিচের দিকে নামে যাতে শিশির বিন্দুদের উৎপত্তি হয়। উষ্ণতার এই নির্দিষ্ট সীমাকে বলে শিশিরপাতের বিন্দু বা 'ডিউ পয়েন্ট'। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক; কাঁচের কিম্বা যে-কোনো ধাতুর



শিশির

চিকন গ্লাসে জল রাখলে গ্লাসের গায়ে শিশির বিন্দুদের দেখা যাবে না। এখন যদি ঐ গ্লাসে বরফের টুকরো ফেলে দেওয়া হয় তাহালেও তৎক্ষণাৎ গ্লাসের গায়ে

শিশির বিন্দুদের আবির্ভাব ঘটবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্লাসের উষ্ণতা শিশির বিন্দুর মাত্রায় পেঁছোয় ততক্ষণ পর্যন্ত শিশির বিন্দুগুলো ফুটে উঠবে না।

তাহলে প্রকৃতি জগতে কখন আমরা শিশির বিন্দুদের দেখা পাবো? প্রথমতঃ গরম বাতাসে থাকতে হবে জলীয় বাষ্প। এই বাতাস ঠাণ্ডা স্তরে এসে মিলবে। তবে মাটির বুকে কখনও শিশিরবিন্দুদের দেখা যাবে না, কেননা সূর্যের তাপে পৃথিবীর মাটি রাতেও গরম থাকে। তাই গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়, মুকুলের আগায় শিশির বিন্দুদের আবির্ভাব ঘটে; কেননা মাটির থেকে ওরা বেশ ঠাণ্ডা।

তবুও গাছের পাতায় যে জলের বিন্দু দেখা যায় তাদের সবটাকেই শিশির বিন্দু বলে না। সকালে গাছের পাতায় জলের যে বিন্দুগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো বেশীর ভাগই শিশির। তবে গাছের পাতার অসংখ্য ছিদ্রগুলো দিয়ে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। এটা অবশ্য গাছেদের জলসেচন ব্যবস্থার ফলে ঘটে থাকে। মাটি থেকে জল টেনে গাছপালা পাতায় পাতায় জল সরবরাহ করে বলেই দিনের সূর্যের তাপে পাতাগুলো ঠিকঠাক থাকে। তবে দিনের বেলায় জলসেচনের কাজ শুরু হলেও রাতেও চলে এই প্রক্রিয়া। তাই দেখা যায় পাতার বুকে জলের কণা। পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গায় প্রচুর পরিমাণে শিশির জমা হয়। শিশিরের পরিমাণ এত বেশী হয় যে, সেখানে গবাদি পশুদের জলপানের জন্যে শিশিরের পুকুরও রাখা হয়।

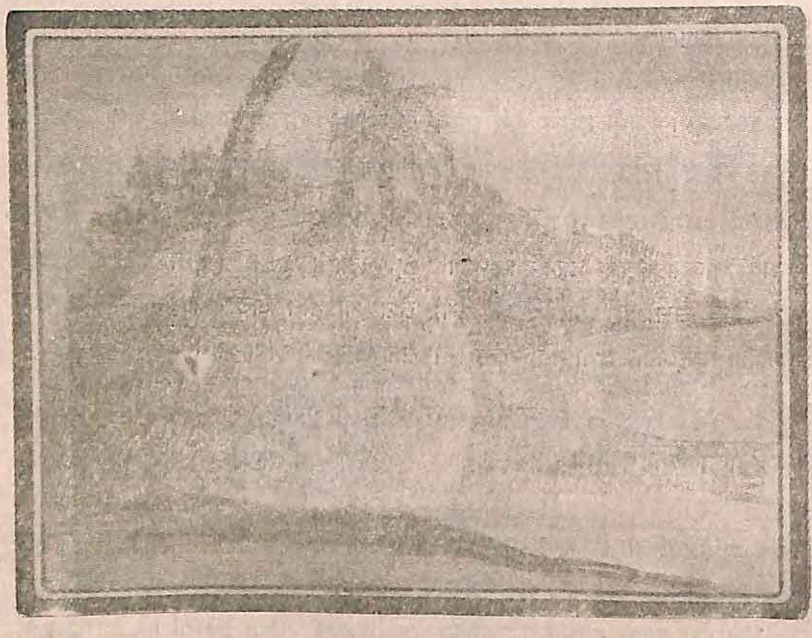
কুয়াশা কাকে বলে?

মাটি-ছোঁওয়া মেঘই হলো কুয়াশা। আবহমণ্ডলে স্বচ্ছন্দ বিহারী মেঘের সঙ্গে কুয়াশার কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে নদী-সাগর, খাল-বিল আর মাটির বুক ছুঁয়ে যে মেঘ চলা-ফেরা করে তাকেই বলে কুয়াশা। ছেটোখাটো জলাশয়ে ও মাটির বুক ঘেঁসে রাতে কিম্বা সকালেই এই কুয়াশা দেখা যায়। ওপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউ নিচে নামে আর তখনই মাটি ও জলের গরম ছোঁয়ায় এই কুয়াশা উৎপন্ন হয়।

শরৎকাল থেকেই শুরু হয় কুয়াশার। মাটি ও জলাশয়ের ওপরকার বাতাস থেকে এই সময়ের আবহমণ্ডলের বাতাস তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। শান্ত রাতে

মাটি ও জলের ঠিক ওপরে কুয়াশার একটা পাতলা আবরণ পড়ে। কেননা রাতের পৃথিবী যত ঠাণ্ডা হয় ততই সেই তলাকার বাতাস ঠাণ্ডা হতে থাকে। যে পরিমাণ সেই আবহমণ্ডলের ঠাণ্ডা বাতাস নিচেকার গরম ভিজে বাতাসের সংস্পর্শে আসে কুয়াশাও তেমনি ঘন হয়। তবে শহরাঞ্চলের কুয়াশার আবরণটা অনেকটা পুরু হয় ; কেননা শহরের বাতাসে থাকে ধুলো, ধোঁয়া আর নানা ধরনের ছোটো ছোটো কণিকা। তাই কুয়াশা তার মোটা চাদর দিয়ে এসব অঞ্চলগুলোকে ঢেকে দেয়।

পৃথিবীর বুকে সব থেকে বেশী কুয়াশা দেখা যায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের বেলাভূমি থেকে কিছুটা দূরের অঞ্চলে। সুমেরুবৃত্ত থেকে যে ঠাণ্ডা জল দক্ষিণ



কুয়াশা

দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তার ওপরে থাকে ভিজে বাতাসের ঢেউ। স্বভাবতই এই বাতাস প্রচণ্ডভাবে ঘনীভূত হতে থাকে, আর ছোট্ট ছোট্ট জলকণায় পরিণত হয়। তবে জলের কণাগুলো বৃষ্টির ফোঁটার মত বড় বড় হয় না বলেই বৃষ্টি নামে না, কুয়াশায় মুড়ে দেয় চারদিক।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোয় কিন্তু অন্যভাবে কুয়াশা সৃষ্টি হয়। ওখানে সকালের ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাস বালিয়াড়ীর গরম বাতাসের সংস্পর্শে আসে, এবং আগের রাতে যদি বৃষ্টি হয়ে গিয়ে বাতাসে জলীয় বাষ্প রেখে যায় তাহলে বাষ্পীয়ভবনের ফলে সেই আর্দ্রতা কুয়াশা হয়ে চারদিক মুড়ে দেয়।

বৃষ্টির থেকে কুয়াশাকে যে বেশী ঘন দেখায় তার একমাত্র কারণ হলো কুয়াশায় জলীয় কণাগুলো বৃষ্টির ফোঁটা থেকে খুব ছোট্ট ছোট্ট। কুয়াশায় অসংখ্য জলকণাগুলো যতটা আলো শুষে নিতে পারে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা তা পারে না। সেই জন্য ঘন কুয়াশা হলে চারিদিকের কোনো কিছুই সহজে দেখতে পাওয়া যায় না, কেননা ঘন কুয়াশার অসংখ্য জলকণাগুলো আলোকে ভালোভাবেই শুষে নেয়।

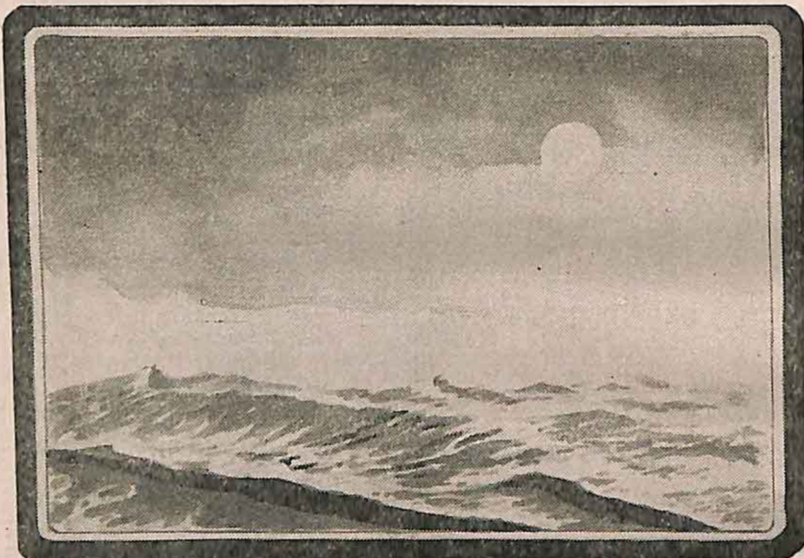
সমুদ্রের জল লোনা কেন ?

মাঝে মাঝে পৃথিবীর এমন এমন ঘটনার সম্মুখীন আমরা হই যা অনেকটা রহস্য ঘন। তাই অতি সহজে আমরা সেই সেই ঘটনার যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে পারি না। এই ধরনের একটা ঘটনা হলো সমুদ্রে লবণের আধিক্য। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সমুদ্রে এত লবণ আসে কোথা থেকে ?

সমুদ্রের জলে এত লবণ আসে কোথা থেকে ? তার উত্তরটা আমরা সহজে দিতে পারব না। তবে এটা আমরা জানি যে, জলেতেই লবণ দ্রবীভূত হয়, সুতরাং বৃষ্টির ধোয়াটে জলে লবণ গলে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে যত লবণ রয়েছে তা জলে দ্রবীভূত হয়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে মেশে।

কিন্তু একথাটা আমরা জোর দিয়ে কখনও বলতে পারবো না যে, ভূ-পৃষ্ঠের লবণের ধোয়াটে জল সমুদ্রে লবণের স্তূপ জমিয়ে তুলছে। যদি কোনো দিন সমুদ্রের সব জল শুকিয়ে যায় তাহলে সমুদ্রের বুকে যে লবণ থাকবে তার পরিমাণটা হবে বিরাট। দেখা যাবে প্রায় ২৮৬ কিলোমিটার উঁচু ও ১·৬১ কিলোমিটার পুরু একটা লবণের দেওয়াল। এই দেওয়াল নিরক্ষবৃত্তের কাছে পেঁছবে। অথবা কথাটাকে যদি একটু ঘুরিয়ে বলা যায় তাহলে বলতে হবে যে লবণের আয়তনটা হবে ইউরোপ মহাদেশের ১৫ গুণ।

যে লবণ আমরা খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করে থাকি তা মূলতঃ পাওয়া যায় সমুদ্রের জল থেকে, লবণহ্রদ ও লবণ প্রস্রবণ থেকে অথবা 'লবণ শিলা' (সৈন্ধব লবণ) থেকে। শতকরা ৩ থেকে ৩½ ভাগ লবণ পাওয়া যায় সমুদ্রের জল ঘন করে নিলে। বিশেষ করে উন্মুক্ত সাগরের জলের থেকে ভূমিবেষ্টিত সাগরের জলে অনেক বেশী লবণ পাওয়া যায়। এজন্যে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে



সমুদ্র

লবণের পরিমাণ অনেক বেশী। মরু সাগরের মোট আয়তন হলো প্রায় ৮৮১ বর্গ কিলোমিটার, এবং এখানে লবণের পরিমাণ হলো প্রায় ১১,৬০০,০০০,০০০ টন। পরিমাণটা খুবই বিস্ময়কর।

গড়পড়তায় হিসেব করলে দেখা যায় যে ৪৫১৬·০৯ ঘন সেন্টিমিটরের চার ভাগের এক ভাগ লবণ সমুদ্রের জলে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লবণ শিলার সে স্তর দেখতে পাওয়া যায় তা লক্ষ লক্ষ বছর আগে সমুদ্রের জল বাষ্পীয়ভবনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রের জলের ১০ ভাগের ৯ ভাগ পরিমাণ বাষ্পীয়ভবনের ফলে লবণ শিলার স্তর গড়ে উঠেছে। তবে যে-সব সমুদ্র আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই লবণের পরিমাণটা অনেক বেশী।

এখানকার জল তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবন হয়, বাইরের জলও অনায়াসে এখানে আসতে পারে না, ফলে লবণ-শিলা তৈরী হয় অনেক তাড়াতাড়ি।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে লবণ তৈরী করা হয় তার বেশীটাই লবণ-শিলা থেকে পাওয়া।

আর্দ্রতা কি ?

আমাদের চারপাশে রয়েছে বাতাসের সমুদ্র। এই বাতাসেই জলীয় বাষ্পের কণারা ভেসে বেড়াচ্ছে। মরুভূমির রুক্ষতায় যে শুকনো বাতাস তাতেও রয়েছে জলীয় বাষ্পের কণারা। বাতাস-সমুদ্রের অস্তিত্ব আমরা স্পর্শের বোধ দিয়ে উপলব্ধি করি, কিন্তু খালি চোখে বাষ্পীয় জল কণাদের আমরা দেখতে পাই না—এরা অদৃশ্য। আর্দ্রতা বলতে বোঝায় বাতাসে জলীয় বাষ্পকণাদের অস্তিত্ব।

যখন আমরা জানাই কোনো বিশেষ জায়গার আর্দ্রতা বেশী, তখন বুঝতে হবে সেই জায়গার বাতাসে বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্পকণরা আছে। তবে বাতাসের একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে এই জলীয় বাষ্পকণাদের ধরে রাখার। যে বাতাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্পকণারা থাকতে পারে তাকে বলে সম্পৃক্ত বায়ু। কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্পকণাদের পরিমাণ যদি আরও বেড়ে যায় তাহলে সৃষ্টি হবে মেঘ, আর মেঘের বুকেই থাকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। সম্পৃক্ত বায়ুর সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পকণাদের পরিমাণ তুলনা করলে 'আপেক্ষিক আর্দ্রতা' পাওয়া যায়। এই হিসাব কষা হয়ে থাকে শতকরা হারে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাসে যতটা জলীয় বাষ্প থাকা সম্ভব তাকেই বলে 'চরম আর্দ্রতা'। দেখা গিয়েছে যে, গরম বাতাস যতটা পরিমাণ জলীয় বাষ্পকণাদের ধরে রাখতে পারে, ঠাণ্ডা বাতাস কিন্তু অতটা ধরে রাখতে পারে না। সুতরাং ঠাণ্ডা বাতাস সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে। যে উষ্ণতায় বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে জমতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু জল কণায় পরিণত হয় তাকেই বলে শিশির কণা। তাহলে যে অবস্থায় শিশিরকণারা আবির্ভূত হয় তাকে বলে 'ডিউ পয়েণ্ট'। আসলে চরম আর্দ্রতার

শুকনো ও ভিজে থার্মোমিটারে আপেক্ষিক আর্দ্রতার চার্ট

	2°	4°	6°	8°	10°	12°
64°	90	79	70	60	51	43
65°	90	80	71	61	53	44
66°	90	80	71	61	53	44
67°	90	80	71	62	53	45
68°	90	80	71	62	54	46
69°	90	81	72	63	55	47
70°	90	81	72	64	55	48
71°	90	81	72	64	56	48
72°	91	82	73	65	57	49
73°	91	82	73	65	57	50
74°	91	82	74	65	58	50
75°	91	82	74	66	58	51
76°	91	82	74	66	59	51
77°	91	83	74	67	59	52
78°	91	83	75	67	60	53
79°	91	83	75	68	60	53
80°	91	83	75	68	61	54

↑ শুকনো মুণ্ডিওয়ালা থার্মোমিটারের উষ্ণতা °F

↑ শুকনো মুণ্ডিওয়লা এবং ভিজে মুণ্ডিওয়লা থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্যের হিসাব (% আপেক্ষিক আর্দ্রতা)

[যদি শুক্‌নো মুণ্ডিওয়লা থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৭৫°F হয় এবং ভিজে মুণ্ডীওয়লা থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৬৫°F হয় তাহলে পার্থক্য হবে ১০, তাহলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৫৩%)

ওপর নির্ভর করেই শিশিরবিন্দুরা ফুটে ওঠে। এবারে উদাহরণে আসা যাক ঃ 'চরম আর্দ্রতায়' এক ঘন মিটারে ৩৯ গ্রাম জলীয় বাষ্পকণারা থাকলে ৩৫° সেণ্টিগ্রেড অথবা ৯৫° ফারেনহাইটে শিশিরকণারা জাগবে অর্থাৎ এটাই হবে 'ডিউ পয়েন্ট'। কিন্তু এক ঘন মিটারে ৫ গ্রাম জলীয় বাষ্পকণারা থাকলে সেই বাতাস 0° সেণ্টিগ্রেডে শিশিরকণাদের জাগিয়ে তুলবে ; অবশ্য 0° সেণ্টিগ্রেড হলো জলের হিমাঙ্ক।

শীতের সকালে বড় গোছের হাই তুললে মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখা যায়। আসলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে থাকে জলীয় বাষ্পের কণারা। শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে জলীয় বাষ্পের কণারা ঠাণ্ডা বাতাসে আরও ঠাণ্ডা হয়, তাই এই বাতাস সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। এই সময় মনে হয় মুখ থেকে গল্‌গলিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বেশী পরিমাণ জলীয় বাষ্পকণাদের বুকে ধরে রাখতে পারে না। শীতের সকালে খাল-বিল-পুকুরের দিকে তাকালেই যে ধোঁয়াটে বাতাস দেখা যায় তা আর কিছুই নয়, সেটা হলো বাতাসের আর্দ্রতা।

গ্রীষ্মের দিনে যদি বাতাসের আর্দ্রতা বেশী হয় তাহলে গায়ে চিট্‌চিটে ঘাম দেখা দেয়। গায়ের ঘাম জমে ত্বকের ওপর। আবার বাষ্পীয়ভবনের ফলে গায়ের ঘাম জুড়িয়ে যায়, তাপও বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাতাসের আর্দ্রতা বেশী হলে জোরালো বাষ্পীয়ভবন হতে পারে না, গায়ের ঘাম গায়ে থাকে বেশী। একটা জব্‌জবে ভাব হয়। তাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঠাণ্ডা বেশী, আর্দ্রতা কম, আরামও বেশী।

বাতাসের আর্দ্রতা মাপবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুটো থার্মমিটার নেওয়া হয় ; একটা থার্মমিটারের মুণ্ডীটা ভিজে তুলো দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়, আর অন্য থার্মমিটারের মুণ্ডীটা থাকে খট্‌খটে শুকনো। আর্দ্রতার ওপরই নির্ভর করে বাষ্পীয়ভবনের কাজ ; যদি আর্দ্রতা কম হয় তাহলে ভিজে তুলো-জড়ানো-মুণ্ডীওয়ালা থার্মোমিটারের পারাটা একটু উঠবে, কিন্তু আর্দ্রতা যদি বেশী হয় তাহলে ভিজে-তুলো-জড়ানো মুণ্ডিওয়ালা থার্মোমিটারের পারা অন্য থার্মোমিটারের পারার সঙ্গে একই মাত্রায় থাকবে।

কোনদিন যদি আবহাওয়াদপ্তর থেকে জানা যায় যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৯০ ভাগ তাহলে বুঝতে হবে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে বাষ্পীয় জলকণারা রয়েছে। দিনটা হবে ভ্যাপসা গরম গোছের। চিট্‌চিটে ঘামে শরীরের জ্বলুনি বাড়বে। দিনটা নিশ্চয়ই আরামের হবে না।

আর্তেজীয় কূপ ও প্রস্রবণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

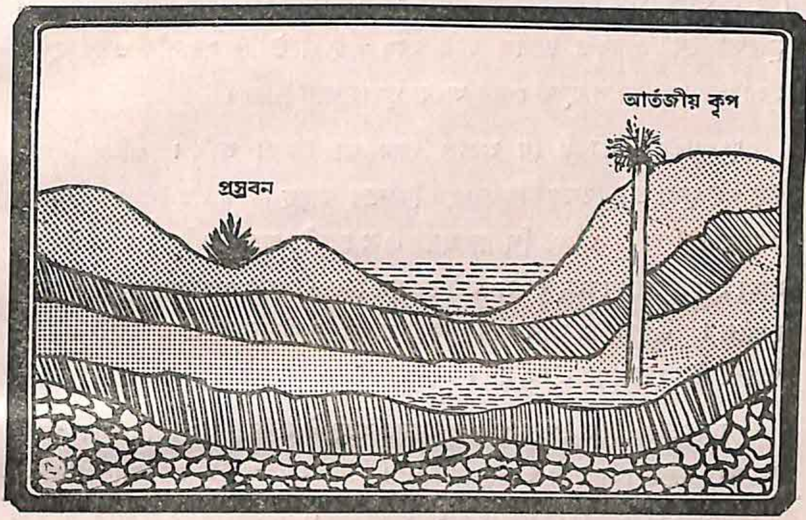
কূপের জল কিম্বা প্রস্রবণের জল নিয়ে শহরবাসীদের কোন চিন্তাভাবনাই থাকে না। কেননা শহরের মধ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শহরতলীতে, গ্রামাঞ্চলে এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঠিকমত জল পাওয়া এখনও একটা প্রবল সমস্যা। পুকুর, সরোবর, টিউবওয়েল, কূয়ো, প্রস্রবণ ইত্যাদির জল না থাকলে এসব অঞ্চলের মানুষ জীবনযাত্রা চালাতে পারত না। কেননা জলের কোনো বিকল্প নেই ; আর জলের অপর নামই জীবন।

বর্ষার সময় বৃষ্টির জল মাটি ও সছিদ্র শিলাস্তর চুঁইয়ে চুঁইয়ে অভিকর্ষজনিত টানে কঠিন শিলাস্তরে জমা হয়। তবে যে শিলাস্তরে এই জল জমা হয় তা সছিদ্র নয়। তাই বৃষ্টির জল মাটি ও সছিদ্র শিলাস্তর ভিজিয়ে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত নামে। ভূ-গর্ভের এই নির্দিষ্ট স্তরের ওপরেই জমা হয় এই জল।

ভূ-গর্ভের এই জমা জল যদি স্বাভাবিক খোলা পথ পায় তাহলে ওপরে বেরিয়ে এসে প্রস্রবণের সৃষ্টি করে। প্রস্রবণের সৃষ্টি তখনই হয় যখন কোনো উপত্যকার ভূমিতল জলের স্তরের চেয়ে নিচেতে থাকে কিম্বা পাথরের বিভিন্ন ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকে গিয়ে দূরের কোনো নিচু মাটির খোলা মুখ পায়। সুতরাং ভূ-গর্ভের কঠিন শিলাস্তরে জলের পরিমাণ যদি বেশী থাকে তবে সেখানে সারা বছরই থাকবে প্রস্রবণের জল ; আর যেখানে জলের পরিম্যণ কম সেখানে বর্ষাকালেই জল জমা থাকে।

যখন দুটো কঠিন শিলাস্তরের চাপে মধ্যিখানের আলগা শিলা, নুড়ি-পাথর এবং বালি চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যায় তখন সেই মধ্যিখানের স্তরে যে জল থাকে তা প্রবল চাপে আটকে থাকে। এ হলো জলের বন্দীদশা। ভূমিতল থেকে জলের এই স্তর পর্যন্ত যদি কোনো ছিদ্র করা যায় তাহলে সেই কারারুদ্ধ জল সবেগে ওপরে বেরিয়ে আসবে। এই ভাবে আর্তেজীয় কূপের সৃষ্টি হয়। আর্তেজীয় কূপের বেলায় থাকে তিনটি স্তর ঃ দুটো কঠিন শিলাস্তর আর একটা সছিদ্র স্তর যা অনেকটা জলের পাইপের মত। তবে এই স্তর তিনটি সম্পূর্ণ আড়াআড়ি ভাবে থাকে না। তারা একটা কোণ তৈরী করে। এই অবস্থায়

ভূ-পৃষ্ঠের প্রবেশ্য স্তর পর্যন্ত কূপ খনন করলে প্রস্রবণের মত জল সবেগে ওপরে উঠে আসবে। এটাই হলো আর্তেজীয় কূপের রূপ।



আর্তেজীয় কূপ

প্রায় আট'শ বছর আগে উত্তর ফ্রান্সের আঁর্তোয়া অঞ্চলে এই ধরনের কূপ খনন করা হয়েছিল। সেই থেকে এই কূপের নাম হয়েছে আর্তেজীয় কূপ। প্রাচীনকালে চীন ও মিশরে এই ধরনের কূপ খনন করার ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক যুগে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই আর্তেজীয় কূপ খনন করা হচ্ছে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় পৃথিবীর বৃহত্তম আর্তেজীয় কূপ খনন করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ভূ-গর্ভের এই জলের উষ্ণতা ১০০° ফারেনহাইটের চেয়ে বেশী হয়, অবশ্য সেখানকার জল ভূ-গর্ভের অনেক নিচে থেকেই উঠে আসবে।

উষ্ণ প্রস্রবণ কি?

প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে তা হয়ত বলে শেষ করা যাবে না। উষ্ণ প্রস্রবণ হলো এমনই একটা জীবন্ত নমুনা। ভূমিতলের আধারে কেন যে গরম জল জমা হয় তাকে জানবার ও বোঝাবার জন্যে মানুষের অসীম কৌতূহল।

এই জল আসছে কোথা থেকে ? এই জল কেনই বা গরম ? আবার কেনই বা এই গরম জল সবেগে ওপরের দিকে ওঠে ? আসলে সমস্ত উষ্ণ প্রস্রবণে ভূ-গর্ভ থেকে ওপর পর্যন্ত একটা গর্ত থাকে। এই গর্তটাকে বলে 'টিউব' বা 'নল'। ভূগর্ভে যে জলাধার রয়েছে তার সঙ্গে এই টিউবটি সরাসরি ভাবে যুক্ত। জলাধারে জল আসে বৃষ্টি থেকে অথবা তুষার গলে গিয়ে।

ভূ-গর্ভের অভ্যন্তর যে অত্যন্ত গরম তা আমরা জানি। গলিত শিলার উত্তাপই ভূ-গর্ভের ভেতরকার তাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গলিত শিলাকে অবশ্য 'ম্যাগামা' বলে। গলিত শিলার গ্যাস এবং বেশীর ভাগ জলীয় বাষ্প পাথরের নানা ফাটল দিয়ে যেমন ওপরে ওঠে তেমনি নিচের জলাধারের জলকে গরম করে তোলে। এখানকার তাপ অনেক সময় জলের স্ফুটনাঙ্কর চেয়ে বেশী। এই ভাবেই উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়।

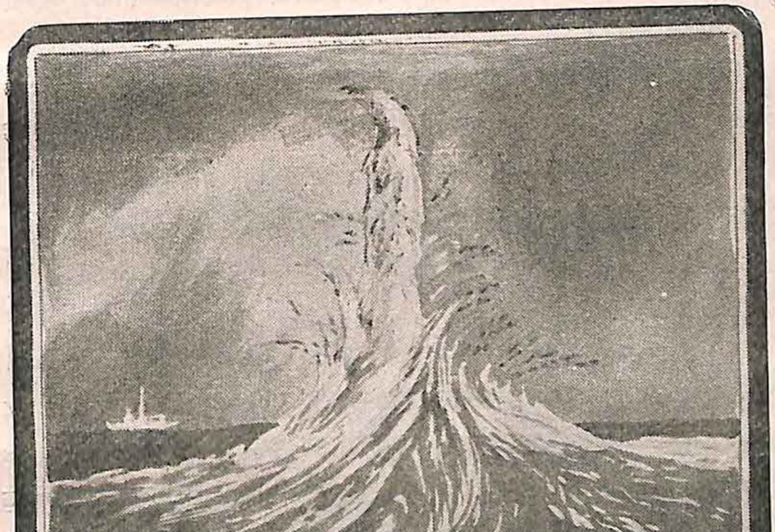
ভূ-গর্ভের গলিত শিলা ও জলাধারের সঙ্গে ঐ টিউবটি অথবা নির্গমন পথটি অনেক সময় সোজাসুজি ভাবে থাকে না। নির্গমন পথটি হয় আঁকাবাঁকা বা বাঁকাচোরা। এর ফলে জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের ওপর সহজভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি এই বাষ্প ও জল স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত তা হলে সেটা হতো উষ্ণ প্রস্রবণ। যেহেতু ভূ-গর্ভ থেকে নির্গমন পথটি বাঁকাচোরা সেইজন্যে তলাকার জল ফুটতে ফুটতে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। আর জলের চেয়ে বাষ্প যেহেতু বেশী আয়তন চায় সেইজন্যে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলে এই বাষ্প ওপরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তলার চাপও কমবে। চাপ কমলে জল থেকে আরও বাষ্প হবে। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এই বাষ্প নির্গত হবে না, বরং বাষ্প দমকে দমকে প্রচন্ড বেগে কুন্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে : এ এক দেখার মত দৃশ্য। নিউজীল্যান্ডে, আইসল্যান্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইয়োলোস্টোন ন্যাশানল পার্কে এই দৃশ্য উপভোগ করার মত। ৬৬½ মিনিট অন্তর অন্তর ইয়োলো ন্যাশনল পার্কের এই 'গেইজার' বাষ্পের ঝলক তুলতে থাকে।

উষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যে ভারতের রাজগীর উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে র‍্যাডনের মত তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণে পাওয়া গিয়েছে। রাজগীর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণটিও উল্লেখ করার মত।

জলস্তম্ভ কি ?

জলস্তম্ভ ও ঘূর্ণিঝড়-এর চরিত্র প্রায় একই ধরনের। বলতে কি জলস্তম্ভ হলো সমুদ্রের বুকে ঘূর্ণিঝড়। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃতি কেমন সেটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার।

যে ঝড় বৃত্তাকারে বেড়ে ওঠে তাকেই বলে ঘূর্ণিঝড়। যে সব এলাকায় বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড় বয় সেখানেই সাধারণত ঘন কালো চোঙের মত মেঘ জমে। আর্দ্র বায়ু যখন ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখনই মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং সেই সময় চোঙাকৃতি ধরনের মেঘ সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণি ঝড়ের পাক খাওয়া অদ্ভুত ধরনের। এই ঝড়, হয় ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরবে, না হয়



জলস্তম্ভ

উল্টো পাকে ঘুরবে। এই ঘূর্ণিঝড় চওড়ায় প্রায় ২৭৪ মিটার থেকে ৩৬৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, আর এর পথ ছোট হলেও কমপক্ষে ৮১ মিটারের মত হয়। তাছাড়া এই পাক-খাওয়া ঘূর্ণি ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১৬১ মিটার থেকে ৮০৫ মিটার হয়। মাটির বুক ঘেঁসে এই ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেলে জীবন ও সম্পত্তির চূড়ান্ত

ক্ষতিসাধন করে। এই ঘূর্ণিঝড়ে বড় বড় বাড়ী মাটির বুকে উলটে পড়ে। কুঁড়েঘর উড়ে যায়, গাছপালা আছড়ে পড়ে, পশুপক্ষী থেকে মানুষ জীবন হারায়, শস্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

অনেক সময় মাটির বুকের ওপরই এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়, তারপর সেই ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরক্ষবৃত্তের কাছ ঘেঁসে যে-সব সমুদ্র ও হ্রদ রয়েছে সেখানেই সাধারণত গ্রীষ্মকালে এই জলস্তম্ভ দেখা যায়। জলের বুকের ওপর ঘন কালো চোঙাকৃতি মেঘ সোজাসুজি ওপরের দিকে উঠতে থাকে। চোঙাকৃতি মেঘের তলার দিকটা প্রথমেই সমুদ্রের ওপরের জলকে মাতিয়ে তোলে এবং গুঁড়িগুঁড়ি জলের হালকা মেঘ তৈরী করে। তারপর সেই পাক-খাওয়া ঘূর্ণিঝড় জলের বুকে চলে যায় আর জলের মধ্যেও ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। জলস্তম্ভের জল কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। কেননা বৃষ্টির জলেই জলস্তম্ভের সৃষ্টি।

জলস্তম্ভের এই ভীষণ-মধুর সৌন্দর্য মাত্র কয়েক মিনিটই থাকে, বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। যে-সব এলাকায় উষ্ণতা বেশী এবং বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি হয় সেখানে সমুদ্রের শান্ত জলের ওপরও এই জলস্তম্ভ সৃষ্টি হতে পারে। পাক-খাওয়া জলস্তম্ভের ভয়ংকর সৌন্দর্য প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি।

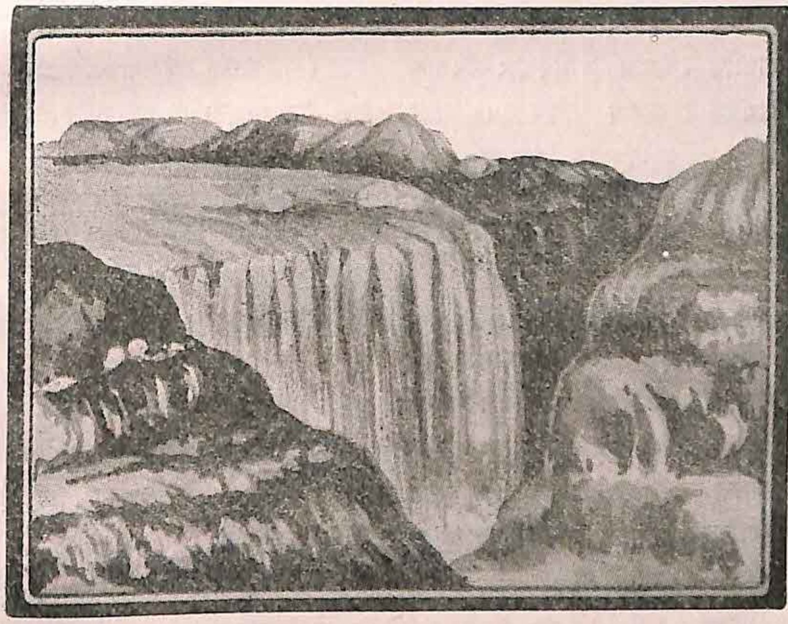
জলপ্রপাত কি ?

যখন কোনো জলধারা কিম্বা নদী মাথা উঁচু করা খাড়া পাথরের দেওয়াল থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সেই জলধারাকেই বলে জলপ্রপাত। প্রবল ও প্রচণ্ড গতিতে যখন সেই জলস্রোত পাথরের বুক কাঁপিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনই জলপ্রপাতের মেজাজ এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলে এর দাপাদাপি, মাতামাতি। তবে অনেক সময় দেখা যায় পাহাড়ী দেওয়ালগুলো সম্পূর্ণ খাড়া অবস্থায় না থেকে কিছুটা মাথা হেলিয়ে জলস্রোতকে বইতে দেয় তখন জলধারা ঝরণার মত ঝরঝরিয়ে পড়ে। এমনও দেখা যায় নদী কিম্বা কোনো জলস্রোতের ধারা পাহাড়ী ধাপে ধাপে ছন্দে ছন্দে নামে—যেন পায়ে পায়ে চলে নাচের তালে তালে।

সুদূর কোন অতীতে গলিত শিলা ঠাণ্ডা হয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে গিয়েছে। কালক্রমে পাথরের একটা শক্ত দেওয়াল তৈরী করে নদীর গতিপথকে দিয়েছে

মুক্ত করে—আর নদীর সেই জলস্রোত মাথা ঝাঁকিয়ে নিচে পড়ে জলপ্রপাতের রূপ নিয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অতীতের কোনো হিমবাহ পার্বত্য উপত্যকার বুক কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল দু'পাশের মাথা উঁচুকরা খাড়া পাথরের দেওয়াল তুলে। হিমবাহ যুগ শেষ হয়ে গেছে। তবে নদীর জলস্রোত শেষ পর্যন্ত জলপ্রপাত তৈরী করে ফেলেছে। অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে মালভূমি উঠেছে আরও উঁচুতে আর এখান দিয়ে জলস্রোত শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়েছে—হয়েছে জলপ্রপাত।

পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত জলপ্রপাতের মধ্যে নায়েগ্রা জলপ্রপাত উল্লেখযোগ্য। উত্তর আমেরিকায় ন্যুইয়র্কের বাফেলোর ২৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নায়েগ্রা



জলপ্রপাত

নদীর জলপ্রপাত বিশ্ববিখ্যাত। অনেকটা ঝুলন্ত পাথরের চওড়া খাঁজে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নেমে-আসা পথ। ওপরের স্তরে রয়েছে ডলোমাইটের কঠিন তল; আর এই ডলোমাইটের তলায় রয়েছে কর্দম শিলা। যখন জলের স্রোত মাথা উঁচু করা ডলোমাইটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সেই ঘূর্ণিজলের স্রোত কর্দম-

শিলাকে ঘা মেরে মেরে টেনে টেনে নিয়ে চলে। ডলোমাইটের কঠিন প্রতিরোধকে যেন মানতেই চায় না এই জলস্রোত। আবার কখনও প্রমত্ত জলধারা ডলোমাইটের বুকে আঘাত হেনে বিপর্যস্ত করে দেয়, ভেঙে ভেঙে পড়ে ডলোমাইটের চাঙাড়। অন্যান্য জলপ্রপাতের বেলায় এই কঠিন শিলাস্তর কখনও বেলেপাথরের, কখনও চুনাপাথরের, কখনও লাভা দিয়ে তৈরী।

তাছাড়া আফ্রিকার জাম্বেসি নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতও নামীদের তালিকায় পড়ে। ভারতের নর্মদা, হুড্রু, জোনহা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত নাম। তবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত হলো ভেনিজুয়েলার অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত। ১৯৩৫ সালে জেমস্ অ্যাঞ্জেল বিমানপথে এটি দেখেন কিন্তু মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে ১৯৪৮ সালে।

এই জলপ্রপাতকে মানুষ কাজে লাগিয়েছে, অর্থাৎ জলের গতিশক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বিশ্বের জলশক্তির প্রায় অর্ধেকটাই রয়েছে আফ্রিকায়। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে আফ্রিকার এই জলশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারা যায় নি।

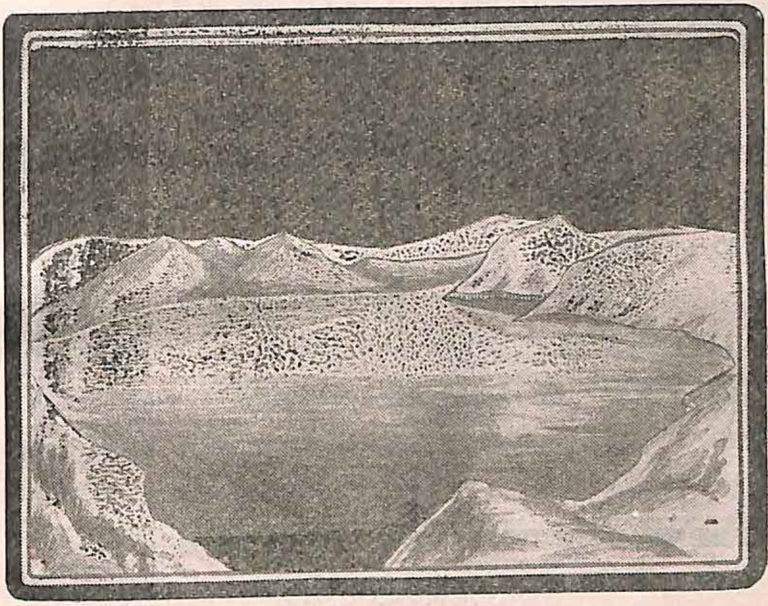
হ্রদ কাকে বলে?

স্থলবেষ্টিত বিস্তৃত জলাশয়কে বলে হ্রদ। ভূ-পৃষ্ঠের যে যে স্থান দেবে গিয়ে আধার তৈরী করেছে তাতেই জমা হয় জল; আর এটাই হলো জলাধার।

নদীর জল আর তুষার গলা জলে হ্রদ পূর্ণ হয়: তাছাড়া ঝরণা, প্রস্রবণ ও অন্যান্য জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে হ্রদের জলে পড়ে। নদীর জল, তুষার গলা জল, ঝরণার জল ও প্রস্রবণের জলেই হ্রদের জীবন।

ভূত্বকের স্তরচ্যুতির ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাধার সৃষ্টি হতে পারে। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদ এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও সৃষ্টি হয় হ্রদের। জ্বালামুখ দিয়ে যে লাভাস্রোত বইতে থাকে তা অনেক সময় উপত্যকার প্রবেশমুখ বন্ধ করে দেয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় জলাধার আর এখানে জল জমেই তৈরী হয় হ্রদ। তাছাড়া মৃত আগ্নেয়-গিরির জ্বালামুখ জলপূর্ণ হয়েও অনেক সময় হ্রদ সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকার ক্রেটার হ্রদ এমনই একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

হিমবাহের ফলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া স্থানগুলোতে জলাধার সৃষ্টি হয়ে হ্রদের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া সমুদ্রতীর অঞ্চলের উপকূলের সীমানা ঘেঁসে সেখানে খাড়ি রয়েছে তার প্রবেশ মুখেও তৈরী হয় হ্রদ। অনেক সময় নদী সমভূমির ওপর দিয়ে চলবার সময় নুড়ি মাটি প্রভৃতিকে টেনে নিয়ে আসে ; ফলে নদীখাত



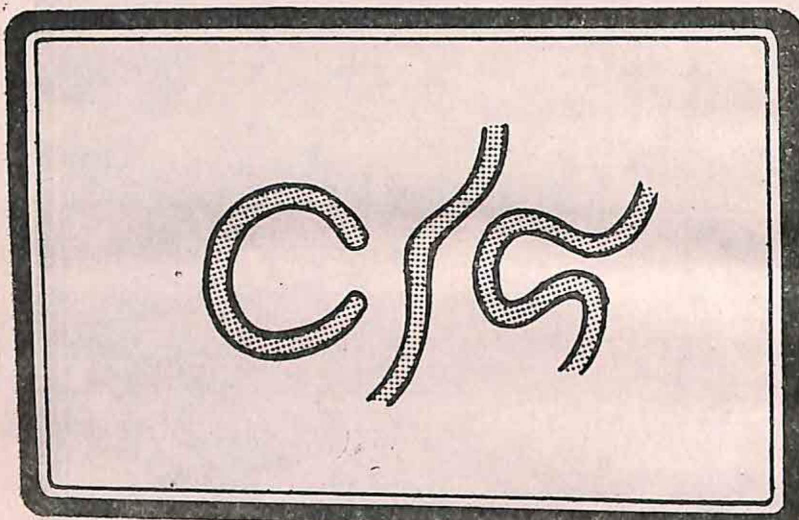
হ্রদ

হয়ে উঠে ভরাট, বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে আসে বন্যা। প্লাবিত অঞ্চলে পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন-ভূমি সৃষ্টি করে। বর্ষায় মাঝে মাঝে বন্যা আসে, ছাপিয়ে যায় দুকূল। এর ফলে দেবে-যাওয়া স্থানে অনেক সময় হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে। আবার যে-সব জায়গায় ভূত্বকের কিছুটা নিচে থাকে চুনাপাথর সেখানে জলস্রোতের ফলে চুনাপাথর গলে গিয়ে সরে সরে যায়, সৃষ্টি হয় অসংখ্য গর্ত। ফলে জলাধার সৃষ্টি হয়ে হ্রদ তৈরী হয়। ফ্লোরিডায় এই ধরনের প্রচুর হ্রদ রয়েছে।

নদী এঁকেবেঁকে চলবার সময় মাটির ঢাল অনুযায়ী বিলম্বিত ছন্দে এগিয়ে চলতে থাকে। অনেক সময় নদীর বাঁকের কোনো একটা অংশ হঠাৎ

বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীর ধারে এ ধরনের অনেক হ্রদ দেখতে পাওয়া যায়।

হ্রদের জল যে সব সময় পরিপূর্ণ থাকবে এ'কথাটা ঠিক নয়। বর্ষা ঋতুতে যদি বর্ষা কম হয় বা বেশী হয় তাহলে হ্রদের জলের পরিমাণ এক থাকবে না। আফ্রিকার চাদ হ্রদ গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শুকিয়ে যায়। আবার গ্রীষ্মকালে কিম্বা



অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি

প্রচণ্ড খরার সময় হ্রদের জল প্রায়ই শুকিয়ে গিয়ে জলের অস্তিত্বই রাখে না। এ সব হ্রদে লবণ গোলা কাদাই শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে যা অনেক সময় একদম শুকিয়ে যায়। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আয়ার হ্রদ ছাড়াও অন্যান্য হ্রদের এই অবস্থা ঘটে।

ভারতের মধ্যে চিল্কা হ্রদ, সম্বর হ্রদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া লবণ হ্রদের কথাটাও মনে রাখা দরকার। খাদ্য লবণের বেশীর ভাগই লবণ হ্রদ থেকে তৈরী করে নেওয়া হয়। মরু সাগরে, গ্রেট লবণ হ্রদে ও ক্যাস্পিয়ান সাগরে লবণের আধিক্য উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় আবার কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়। বিশেষ করে নদীর বাঁধ বাঁধবার সময় এই কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়।

জল-দূষণ কাকে বলে ?

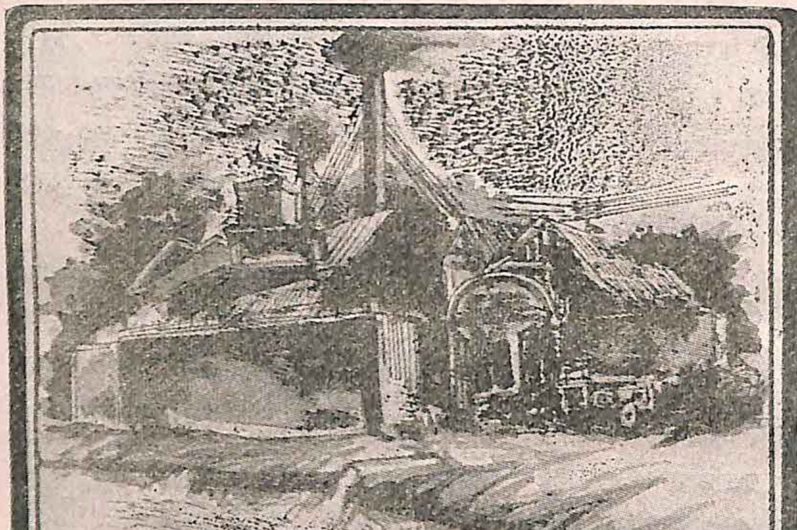
জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া জীবন ধারণ করা অসম্ভব এবং জলের বিকল্পও নেই।

আমাদের পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। এই জলের শতকরা ০'৬৯ ভাগ জল মানুষ ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ৩০০০ ঘন কিলোমিটার জল ব্যবহার করছে। কিন্তু যে জল মানুষের প্রাণ সেই জলই যে আজ কতটা দূষিত তা সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। অন্ততঃ, বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

শহরাঞ্চলের সমস্ত ময়লা আবর্জনা এবং কারখানাগুলোর ময়লা গাদ নর্দমা ও খাল দিয়ে গিয়ে পড়েছে নদীর জলে। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর থেকেই প্রতিদিন ২০০,০০০,০০০ গ্যালন ময়লা আবর্জনা হাডসন নদীতে গিয়ে পড়ছে। বোম্বাই শহরের সব আবর্জনা পড়ছে আরব সাগরে, আর কলকাতার আবর্জনা পড়ছে গঙ্গায়। এইসব নোংরা এবং বিষাক্ত আবর্জনা পড়ে জল প্রচণ্ডভাবে দূষিত হচ্ছে। এই দূষিত জল ব্যবহার করলে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি নানা ধরনের রোগ দেখা দেবেই।

এই দূষিত জল যে কত বিষাক্ত তা নিয়ে বহু সমীক্ষা হয়েছে। প্রতি বছর দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে বেড়ানোর মেজাজ নিয়ে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরব সাগরের উপকূলে অক্সিজেনের অভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ প্রাণ হারালো। ১৯৫২ সালে সান দিয়াগো বন্দরে দূষিত জলের প্রভাবে ৩৭,৮০,০০০ মাছ অকালে প্রাণ হারালো। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কাগজের কলে একটন কাগজ তৈরী করতে জল লাগে ২৫০ টন বিশুদ্ধ জল ; ইস্পাত কারখানায় এক টন ইস্পাত তৈরী করতে লাগে ১৫০ টন জল ; মোটর গাড়ির কারখানায় একখানা গাড়ি তৈরী করতে লাগে ৫০ হাজার গ্যালন জল ; এক টন অপরিশোধিত তেল শোধন করতে লাগে ১৮০ টন জল ; এক টন নাইট্রেট সার তৈরী করতে লাগে ৬০০ টন জল। বিভিন্ন কারখানা থেকে যখন এই জল বেরিয়ে যায় তখন ব্যবহৃত এই-জল নিজ ওজনের চেয়ে দশ থেকে একশ গুণ ওজনের বিশুদ্ধ জলকে দূষিত ও বিষাক্ত করে তুলতে সক্ষম।

নদী-খাল-বিল ও নদী-সাগরের জল এইভাবে দূষিত হচ্ছে ; তাছাড়া আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে জলেতে তেল-ময়লার সর জলকে নোংরা করে তুলছে। জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ার সঙ্গে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও শেওলা মরে যাচ্ছে এবং যে পরিমাণ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে যেতে পারত তা



কারখানার ময়লা গাদ

যাচ্ছে না ; তাছাড়া সামুদ্রিক প্রাণীরাও মরে যাচ্ছে দিনে দিনে। বিগত পঞ্চাশ বছরে এক হাজারের মত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরকালের মত অবলুপ্ত হয়েছে।

খাল-বিল-সরোবর, নদী-সমুদ্র ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকে জল জলীয় বাষ্পরূপে আবহমণ্ডলে চলে যাচ্ছে আবার বৃষ্টি ও শিশিরের রূপ নিয়ে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসছে। এই জলের পরিমাণ প্রায় ৩৭০০০ ঘন কিলোমিটার। কিন্তু এই জল মোটেই বিশুদ্ধ নয়। কেননা বাতাসে মিশে রয়েছে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড। এছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড তো থাকছেই। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বৃষ্টির জলের

সঙ্গে নেমে আসছে সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং কার্বনিক অ্যাসিড। ফলে জলের অম্লতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গাছ-গাছালি, পশু-পাখী, বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বলাবাহুল্য এই বিপর্যয় থেকে মানুষও রক্ষা পাচ্ছে না। জলচর জীবদের মধ্যে মাছ তো মরছেই, এমনকি তাদের প্রজনন ক্ষমতাও বিনষ্ট হচ্ছে।

অন্যদিকে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে এবং শস্যকীট মারার জন্যে যে সব রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে তা বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে পুকুর-নদী-নালা থেকে সাগরে পর্যন্ত পেঁছে যাচ্ছে। অ্যামোনিয়াম সালফেট্, সুপার ফসফেট্ প্রভৃতি রাসায়নিক সার তো আছেই, বিশেষ করে কীটনাশক পদার্থ হিসাবে ফলিডল ও ডি. ডি. টি. ছড়ানো হচ্ছে। অবশ্য ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ডি. ডি. টির ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত। জলেতে মিশে থাকছে এই বিষ। গাছপালা তো বটেই শাক-সবজীর ভেতর এই বিষ সংরক্ষিত হচ্ছে ; কেননা গাছ-গাছালি মাটি থেকে রস শোষণ করার সময় এই বিষ টেনে নিচ্ছে। গরু মোষ খাচ্ছে ঘাস, তাই দুধে থাকছে এই বিষ ; মানুষ শাকসবজী ব্যবহার করছে তাই মাতৃ দুগ্ধও এই বিষ বহন করছে। বিশেষ করে ডি. ডি. টি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে একবার প্রবেশ করলে সহজে বিনষ্ট হয় না, দেহের চর্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে এটি স্থায়ীভাবে সঞ্চিত থাকে। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের দেহেই ডি. ডি. টি রয়েছে তবে ভারতীয়দের দেহেই এর পরিমাণ বেশী।

জল দূষণের ফলে গাছপালা থেকে পশু-পাখী ও মানুষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে জীবনী-শক্তি। শেষ পর্যন্ত আসছে মৃত্যুর পরোয়ানা !

প্রসঙ্গতঃ একথাটাও মনে রাখতে হয় যে, তেজষ্ক্রিয় পদার্থের বর্জ্যও জলের প্রাণদায়িনী শক্তিকে বিনষ্ট করছে। বিশেষ করে ভূগর্ভে ও জলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যেসব মদমত্ত যুদ্ধবাজ শক্তিবর্গ ক্ষমতার বড়াই করছে তারাও জীবনের শত্রু।

দিকে দিকে আজ সুস্থ জীবনপ্রেমিক বিজ্ঞানীরা সোচ্চারে ঘোষণা করছেন জীবনকে বাঁচাতে হলে পৃথিবীকেও বাঁচাতে হবে ; দূষণের হাত থেকে মানুষই রক্ষা করতে পারে জীবদাত্রী ধরিত্রীকে। কি ভাবে এবং কেমন করে এই অবস্থার

মোকাবিলা করা যায় তার জন্য বিশ্বের জীবন-প্রেমিক বিজ্ঞানীরা জেগেছেন এবং জানাচ্ছেন এর প্রতিকারের উপায়।

প্রতিটি মানুষকে প্রাণের স্বার্থেই প্রতিরোধের এই সংগ্রামে নামতে হবে।

অ্যাসিড বৃষ্টি কি ?

অ্যাসিড বৃষ্টি কথাটা শুনতে অদ্ভুত ধরনের হলেও প্রকৃতির রাজ্যে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। এই অ্যাসিড বৃষ্টিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছও মরে যায়। দক্ষিণ নরওয়েতে এই ধরনের অ্যাসিড বৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চলে এই ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে যদি বৃষ্টির জলে প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে।

সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন অক্সাইড স্বাভাবিকভাবে এবং বহু ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপের জন্যেও উৎপন্ন হয়ে চলেছে। আগ্নেয়গিরি থেকে সালফার ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড নির্গত হচ্ছে, তেমনি পৃথিবীতে জৈবক্রিয়া সম্পাদনেও বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় কলকারখানা থেকেও কয়লার ধোঁয়া কার্বন মনো-অক্সাইড আবহমণ্ডলের বাতাসকে কলুষিত করছে।

সালফার ডাই-অক্সাইড এবং সালফাইড গ্যাস আবহমণ্ডলের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে তেমনি বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন অক্সাইড রূপান্তরিত হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিডে।

অবশ্য অ্যাসিড বৃষ্টি হলেই যে গাছ-গাছালি, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ, সামুদ্রিক জীবজন্তু ও মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা নয়। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব কেমন হবে তা বিভিন্ন অবস্থার ওপর নির্ভর করে। বৃষ্টির পরিমাণ, অ্যাসিডকে দূর করার জন্যে বিশেষ অঞ্চলের খনিজ পদার্থের পরিমাণ কতটা তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়।

অ্যাসিড বৃষ্টির ফল যে ক্ষতিকর সে বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই। তবে কম আর বেশী। বিশেষ করে পরিবেশের যে ভারসাম্য তা বজায় রেখেই পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ও বিবর্ত্তণ। কিন্তু কোনোভাবে যদি সেই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় তাহালে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বেই। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা অ্যাসিড বৃষ্টির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন এবং কি ভাবে এর প্রতিরোধ করা যায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলছেন।

জাতীয় পরিবেশ ও প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থার এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, আহমেদাবাদ, কানপুর, হায়দ্রাবাদ, প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! বিশেষ করে, মথুরা তৈল শোধনাগার ও অন্যান্য শিল্প-সংস্থা থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইডের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তাজমহলের মর্মর প্রস্তরে, মথুরার বিভিন্ন মন্দিরে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্তম্ভগুলিতে। আগ্রার বায়ুমণ্ডলে প্রতি ঘন মিটারে ১০০ মাইক্রোগ্রাম সালফার ডাই-অক্সাইডের সন্ধান মিলছে। মোট কথা এর ফলে অ্যাসিডবৃষ্টিতে শুধু মাত্র প্রাচীন স্মৃতি সৌধগুলি বিনষ্ট হবে না, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ওপর নেমে আসবে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া।

সুতরাং জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীদের কথা আমাদের শুনতে হবে, রক্ষা করতে হবে পৃথিবীকে, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে।

সারণী ঃ ১

পৃথিবীতে পরিষ্কার জলের পরিমাণ

জলরূপে	আয়তন (মিলিয়ন ঘন কিলোমিটার হিসাবে)	শতকরা হার
মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ	২৪.৮০	৭৭.০০
ভূগর্ভস্থ জল (ব্যবহার যোগ্য)	৩.৬	১১.১০
ভূগর্ভের সর্বনিম্নস্তরের জল	৩.৬	১১.১০
হ্রদ ও নদী	০.১৩	০.৪৪
ভূমি পৃষ্ঠের সম্পৃক্ত জল	০.০৯	০.৩০
আবহমণ্ডল	০.০১৪	০.০৪৩
মোট হিসাব	৩.২২	১০০

সারণী ঃ ২

কীটনাশক পদার্থে বিষক্রিয়া

কীটনাশক পদার্থ	কি ক্ষতি করে
জৈব ক্লোরিন, যৌগ ডি. ডি. টি. বি. এইচ. সি, অ্যালড্রিন	পেটের গোলমাল, বমি, মাথাধরা, চর্মরোগ, ফুসফুস-বৃক্ক যকৃৎ ও শ্বাসনালীর ক্ষতি এবং ক্যানসার
ফসফরাস যৌগ মালাথিয়ন, পারাথিয়ন	শরীরে কোলিনস্টিয়ারেজ উৎপাদনে বাধা, চর্মরোগ
কার্বনেট যৌগ কারবারিল	ঐ

সারণী—৩

পৃথিবীতে হিমবাহের এলাকা

অঞ্চল	হিমবাহ (মিলিয়ান বর্গ-কিলোমিটার হিসাবে)	অঞ্চলের মোট হিমবাহের শতকরা হিসাব
য়্যাণ্টার্টিকা	৩	৮৫
গ্রীণল্যাণ্ড	১'৮	১২
আর্কটিক ও আইসল্যাণ্ড	০'৩	
এশিয়া	০'১	
হিমালয়	০'০৩৩	
কারাকোরাস,	০'০১৬	
উত্তর আমেরিকা	০'০৮	৩
দক্ষিণ আমেরিকা	০'০৩	
ইউরোপ	০ ০১	
নিউজীল্যাণ্ড, আফ্রিকা, নিউগিনি	০'০০১	

সারণী—৪

ভারতে সালফার ডাই-অক্সাইডের উৎস (অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ)

(১৯৭৪ সালের সমীক্ষা)

উৎস	সালফার ডাই-অক্সাইড, (মিলিয়ন পাউণ্ড)	শতকরা পরিমাণ
১. কয়লার দহনে	৩০৪০.০০	৯৪.৭৫
২. তামার উৎপাদনের জন্যে	২০.৫৮	০.৬৪
৩. দস্তা উৎপাদনের জন্যে	৪১.৪২	১.২৯
৪. সালফিউরিক অ্যাসিডের শিল্পোৎপাদনের জন্যে	৯৮.২১	৩.০৭
৫. মণ্ড ও কাগজ শিল্পে	৮.১২	০.২৫
	৩২০৮.৩৩	১০০.০০

সারণী—৫

ভারতের কয়েকটি শহরে সালফার ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব

(অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ)

শহরের নাম	সালফার ডাই-অক্সাইডের গড় ঘনত্ব (প্রতি ঘন মিটারে)
১. বোম্বাই	৪৭.১১
২. নয়াদিল্লী	৪১.৪৩
৩. কলিকাতা	৩২.৮৮
৪. কানপুর	১৫.৯৭
৫. আহমেদাবাদ	১০.৬৬
৬. মাদ্রাজ	৮.৩৮
৭. নাগপুর	৭.৭১
৮. হায়দ্রাবাদ	৫.০৬
৯. জয়পুর	৪.১৫

টীকা ঃ

১। অভিকর্ষ ঃ

পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের নাম অভিকর্ষ। কোনো ভারী বস্তু হাতে নিলে আমরা একটা নিম্নমুখী টান অনুভব করি এই আকর্ষণ বলের জন্যে। কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে সেই বলের মোট পরিমাণই বস্তুর ওজন।

২। অ্যাসিড ঃ

অ্যাসিড এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। এই রাসায়নিক যৌগের অণুতে ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেনের পরমাণু থাকে। সাধারণত, অ্যাসিডের স্বাদ অম্ল। তাছাড়া অ্যাসিড তীব্র জারক পদার্থ। বিভিন্ন ধরনের পদার্থ অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে পুড়ে যায়, অনেক সময় ক্ষয়ে যায়। তাছাড়া অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসের রঙ লাল করে দেয়। অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়া হলে লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।

৩। আবহমণ্ডল ঃ

আবহমণ্ডলের বিস্তৃতি যদিও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ কিলোমিটারের মত তবুও আবহমণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগ ৩২ কিলোমিটারের মধ্যে আবদ্ধ। ভূ-পৃষ্ঠের সংলগ্ন এলাকাতেই আবহাওয়ার ঘনত্ব বেশী। এই আবহমণ্ডলের চারটি স্পষ্ট স্তর—(১) ট্রপোস্ফিয়ার (২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (৩) আয়নোস্ফিয়ার (৪) এক্সপোসার।

এই ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যে ৭৫% নাইট্রোজেন, ২৩% অক্সিজেন এবং ২% আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প রয়েছে—এবং এটা হলো প্রাণের উপযুক্ত পরিবেশ। স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে রয়েছে ওজনের (Ozone) অস্তিত্ব যা সূর্যের অতি-বেগুনী-রশ্মিকে শোষণ করে নিচ্ছে। আয়নোস্ফিয়ারে রয়েছে বিদ্যুতাহিত কণারা। এদের মাধ্যমেই বেতার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।

৪। কোষ ও কলা ঃ

জীবদেহের একক হলো জীবকোষ (cell)। যেমন একটা একটা করে ইঁট গেঁথে একখানা বাড়ী তৈরী হয় তেমনি অজস্র জীবকোষের বন্ধনে জীবদেহ তৈরী হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের মধ্যে এই কারণেই সাদৃশ্য, কেননা তাদের প্রাণ আছে। কোষের মধ্যেই প্রোটোপ্লাসম বা প্রাণপঙ্ক বলে এক ধরনের জেলির মত পদার্থ আছে। উদ্ভিদ কোষে থাকে নির্জীব কঠিন আবরণের কোষ প্রাচীর। যেহেতু উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর পার্থক্য আছে সেই কারণেই প্রাণীকোষে এই নির্জীব কোষ প্রাচীর নেই। প্রাণপঙ্ককে ধরে রাখার জন্যে কোষের চারপাশে প্লাজমালিমা নামে স্বচ্ছ ভেদ্য সজীব পদার্থ আছে। অবশ্য এই প্রাণপঙ্কের বিভিন্ন অংশকে নানা পরিভাষা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কোষের মধ্যেই রয়েছে নিউক্লিয়াস। এর মধ্যেই বংশগতির সব রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রাণী একটি মাত্র কোষ দিয়ে জীবন শুরু করে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা প্রণালী খুবই জটিল, তাই নানা ধরনের কাজকর্মের কোষগুলির শ্রম-বিভাজন প্রয়োজন হয়। এক এক রকম কোষ এককভাবে বা যুক্তভাবে এক-এক রকমের কাজ করে। বিভিন্ন রকম কাজ করার জন্যে কোষগুলির বিভিন্ন ধরনের আকৃতি হয় ? তাই সংঘবদ্ধভাবে যে-সব কোষগুলি একই রকমের কাজ করে তখন তাদের বলা হয় কলা (Tissue)।

৫। খনিজ পদার্থ ঃ

সাধারণভাবে একটি খনিজের জন্ম হয় গলিত ম্যাগমা থেকে। তবে কেলাসন (Crystallisation) এবং পৃথিবীকরণ হলেই খনিজের জন্ম হয়। এ ছাড়া গ্যাসীয় পদার্থ থেকে কিম্বা আগেকার কোনো খনিজ বা শিলা থেকে রূপান্তরের ফলেও খনিজের জন্ম হয়। তবে খনিজের উৎপত্তি যে-ভাবেই হোক না কেন তাতে তাপ, চাপ এবং তরল বায়বীয় পদার্থের খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। লোহা, তামা, দস্তা ইত্যাদি হলো অজৈব খনিজ পদার্থ, আবার কয়লা হলো জৈব খনিজ পদার্থ।

৬। ঘনাঙ্ক ঃ

কোনো পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনে কি পরিমাণ বস্তু আছে তা ঘনাঙ্কের এককে প্রকাশ করা হয়। যে কোনো পদার্থের এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনে যত গ্রাম বস্তু আছে তা-ই হলো বস্তুটির ঘনাঙ্ক (Density)।

৭। নিরক্ষবৃত্ত ঃ

যাকে পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলা হয়, আসলে সেটি একটি কল্পিত রেখা। এই কল্পিত রেখার দুটি প্রান্ত শেষ হয়েছে দুটি স্থির নির্দিষ্ট বিন্দুতে। উত্তরের বিন্দু হলো উত্তর মেরু বা সুমেরু, দক্ষিণের বিন্দু হলো দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। এই দুটি মেরুবিন্দু থেকে সমান দূরত্বে আরও একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাটি পূর্ণবৃত্ত, কেননা পৃথিবীর আকারটাই তো গোলীয় এই কল্পিত রেখাটিকে বলে বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা।

৮। পর্যায়-সারণী (**Periodic table**) ঃ

মৌলিক পদার্থগুলির পারমাণবিক সংখ্যার হিসেবে তৈরী একটা ছক-কাটা পর্যায়ক্রমিক তালিকা। বিভিন্ন পদার্থের গুণ ও ধর্মের যে পৌনঃপৌনিক পর্যায়ক্রম দেখা যায় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ (রুশ বিজ্ঞানী) এক সুসম্বন্ধ সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন, যা পিরিয়ডিক-ল নামে পরিচিত।

৯। মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ ঃ

যে-সব পদার্থ একই ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এবং কোনো রকম বিশ্লেষণে যে পদার্থে অন্য কোনো গুণ বা অন্য কোনো ধর্মের অণু-পরমাণু মেলে না তাদেরই বলে মৌলিক পদার্থ (Element)। পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে।

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে-সব পদার্থ সৃষ্টি হয় তাদের বলে যৌগিক পদার্থ। যেমন, জল। দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের উৎপত্তি।

১০। শিলা ঃ

ভূ-ত্বক কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরী। এই কঠিন পদার্থ মূলতঃ খনিজ পদার্থ। কখনও কোনো বিশেষ একটি খনিজ পদার্থ আবার কখনও অনেকগুলি খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে শিলা তৈরী হয়। তবে খনিজ পদার্থের যেমন একটি বিশেষ রাসায়নিক রূপ থাকে শিলার বেলায় কিন্তু তা থাকে না। শিলার তিন রূপ ঃ পাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা, রূপান্তরিত শিলা।

১১। স্ফুটনাঙ্ক ঃ

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটতে থাকে। তাই কোনো তরল পদার্থ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে উষ্ণতায় ফুটতে আরম্ভ করে তাকেই সাধারণভাবে তার 'স্ফুটনাঙ্কের উষ্ণতা' বলা হয়।

১২। হিমাঙ্ক ঃ

সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপে যে নির্দিষ্ট নিম্ন উষ্ণতায় কোনো তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে জমতে শুরু করে তা-ই হলো তরল পদার্থের হিমাঙ্ক। জল জমে বরফ হয় 0° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায়।